প্রকাশক :

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

৫।১এ কলেজ রো

কলিকাতা - ৯

তৃতীয় প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ : প্রভাত কর্মকার

মুদ্রাকর :

শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ

দি নিউ কমলা প্রেস

দৈত্যরাজ আর দেবকন্যা

হিমালয় পাহাড়ের ওদিকে বিজন বন। সেই বনের পরে দৈত্যপুরী। দৈত্যপুরীর রাজা দৈত্যরাজ।

দৈত্যরা ভালো মানুষ নয়, বিশেষ তাদের রাজাদের যেমন দাপট, তারা তেমনি নিষ্ঠুর। এখন যিনি দৈত্যরাজ, তিনি কিন্তু ভালো। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধবিরোধ করেন না—মানুষের উপরে উৎপীড়ন-অত্যাচার করেন না⋯চুপচাপ থাকেন নিরীহের মতো।

একদিন দৈত্যরাজের খেয়াল হলো - হিমালয় পার হয়ে এদিকে পৃথিবীতে নামবেন, পৃথিবীর মানুষজনকে দেখবেন,—দেখবেন, পৃথিবীর কোথায় এখন কি হচ্ছে।

তিনি এলেন মানুষ সেজে মানুষের বেশে। হিমালয়ের কোলে ভারতবর্ষে এসে এখানে-ওখানে ঘুরে সব দেখছেন শুনছেন⋯হঠাৎ দেখেন, অনেক লোকজন, সেপাই শাস্ত্রী আর হাতী-ঘোড়া নিয়ে এক রাজপুত্র এসেছেন অরণ্যে মৃগয়া করতে। রাজপুত্র যেমন সুশ্রী সুপুরুষ, তেমনি তাঁর সাহস। রাজপুত্রকে দৈত্যরাজের ভারী ভালো লাগলো।

দৈত্যরাজের ছেলেমেয়ে নেই—দৈত্যরাজ ভাবলেন, এই রাজপুত্রকে যদি নিজের পুরীতে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে

এঁকে ছেলের মতো আদর যত্ন করবেন—তারপর তিনি মারা গেলে এই রাজপুত্রকেই তিনি করে যাবেন দৈত্যরাজ্যের রাজা।

এখন কি করে রাজপুত্রকে নিয়ে যাওয়া যায়?

ভাবতে ভাবতে উপায় স্থির হলো। যেমন উপায় স্থির হওয়া, অমনি দৈত্যরাজ ধরলেন একটা খুব তেজী ঘোড়ার রূপ। ধপধপে সাদা ঘোড়া। ঘোড়া সেজে তিনি রাজপুত্রের দলের সামনে দিয়ে টগবগ্ টগবগ্ শব্দে ছুটে চললেন—চললেন হিমালয়ের দিকে।

ঘোড়ার যেমন চেহারা, তেমনি তেজী দেখে রাজপুত্রের হলো লোভ, ঐ ঘোড়া ধরতেই হবে। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার নেই - নিশ্চয় পাহাড়ী ঘোড়া। রাজপুত্র তাকে ধরবেন বলে তার পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন।

তাঁর দলবল কোথায় পড়ে রইলো, সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। সাদা ঘোড়া চলেছে বাতাসের বেগে, তার নাগাল পায় না রাজপুত্র, তবু রাজপুত্র তার পিছনে পিছনে সমানে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। ছুটতে ছুটতে সাদা ঘোড়া উঠলো হিমালয় পর্বতে···রাজপুত্রও উঠলেন পর্বতে।

পাহাড়ে অনেক উঁচুতে উঠে সাদা ঘোড়া থামলো। রাজপুত্র ভাবলেন ঘোড়া হাঁফিয়ে পড়েছে। রাজপুত্র এলেন ঠিক তার আগে—এসে নিজের ঘোড়া থেকে নামলেন; নেমে তিনি উঠলেন সাদা ঘোড়ার পিঠে। যেমন তিনি সাদা ঘোড়ার পিঠে বসেছেন, সাদা ঘোড়া অমনি তাঁকে নিয়ে ছুটলো··· ছুটলো হিমালয়ের ওধারে দৈত্যপুরী—সেই দৈত্যপুরীর দিকে।

দৈত্যপুরীতে এসে সাদা ঘোড়া থামলো। রাজপুত্র নামলেন তার পিঠ থেকে। তিনি পিঠ থেকে নামতেই সাদা ঘোড়ার রূপ ত্যাগ করে দৈত্যরাজ ধরলেন নিজের রূপ।

দেখে রাজপুত্র অবাক!

দৈত্যরাজ বললেন—রাগ করোনা রাজপুত্র। আমি দৈত্যরাজ, পৃথিবী দেখতে নেমেছিলুম—আমার ছেলেমেয়ে নেই। তোমাকে দেখে আমার এত ভালো লেগেছে যে তোমাকে না নিয়ে আসতে পারলুম না। তোমাকে আমি

ছেলের মতো আদর-যত্নে রাখবো, তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারবো না! আমি মরে গেলে দৈত্যপুরীর সিংহাসনে তুমি বসবে রাজা হয়ে। এখানে তোমার কোনো দুঃখ, কোনো কষ্ট, কোনো অসুবিধা হবে না।

রাজপুত্র বললেন—কিন্তু আমার বাবা? আমার মা? তাঁরা যে আমার জন্য শোকে আকুল হবেন!

দৈত্যরাজ বললেন,—তাঁদের আমি খবর পাঠাবো, তুমি ভালো আছে— এখানে তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।

রাজপুত্র ভাবলেন—নিজের রাজ্যে তো এতকাল ছিলুম—মানুষ তো বিদেশে বেড়াতে যায়—মনে করবো বিদেশে বেড়াতে এসেছি। দৈত্যপুরীতে কিছুকাল থাকা যাক! বেচারী এত করে বলছে! আমি চলে গেলে, বলছে, ও বাঁচবে না! আহা!

রাজপুত্র দৈত্যপুরীতে রইলেন দৈত্যরাজের সঙ্গে। দৈত্যরা তাঁর হুকুম তামিল করে—তাঁকে মানে রাজার মতো। তাঁর যত্ন-আদরেরও সীমা নেই। তার উপর এদিকে সেই দেবলোক পর্যন্ত ঘুরে আসা যায়!

রাজপুত্রের চমৎকার লাগছে।

দিন যায়, মাস যায়—ছ'মাস কাটলো।

একদিন দৈত্যরাজ বললেন রাজপুত্রকে—আমাকে বিশেষ কাজে কিছুদিনের জন্য বাইরে যেতে হবে—আটদিন পরে ফিরবো। এ আটদিন তুমি রাজ্য পরিচালনা করবে এখানকার রাজা হয়ে। তোমাকে এই চাবি দিয়ে যাচ্ছি—পুরীর পিছনে বাগান আছে, সে বাগানের দরজা তালাবন্ধ থাকে। এই চাবি দিয়ে সে তালা খোলা যায়। তুমি দরজা খুলে বাগানে যেতে পারো কিন্তু একা যাবে। আর বাগানে সারাদিন থাকতে পারবে, তবে সন্ধ্যার আগেই বাগান থেকে পুরীতে ফিরবে। সন্ধ্যার পরে বাগানে থাকবে না।

রাজপুত্রের হাতে বাগানের চাবি দিয়ে দৈত্যপুরী ত্যাগ

করে দৈত্যরাজ চলে গেলেন। যাবার সময় দৈত্যদের বলে, গেলেন—আমি যতদিন থাকবো না, ততদিন ইনিই তোমাদের রাজা—এঁকে সকলে রাজা বলে মানবে—ইনি যা হুকুম করবেন সে হুকুম তামিল করবে।

দৈত্যরাজ চলে যাবামাত্র রাজপুত্র চাবি খুলে বাগানে ঢুকলেন। এতকাল এখানে আছেন, বাগানের কথা জানেনও না।

কী চমৎকার বাগান। কত রকম ফল-ফুলের গাছ; কিন্তু কোনো গাছে সত্যিকারের ফল-ফুল নেই—হীরা চুনী মণিমুক্তার ফল ফুল। বাগানের মাঝখানে মস্ত দীঘি—দীঘির জল রূপার মতো ঝকঝক করছে—আয়না। পরিষ্কার—দীঘির তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। দীঘির ঘাটে শ্বেত পাথরের সিঁড়ি—সে সিঁড়িতে কত রকম মণিমুক্তা আঁটা।

রাজপুত্র বসলেন দীঘির ঘাটে—বড় একটা গাছের তলায়। বসে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন আর মনে কত কথা জাগছে!

রাজপুত্র ভাবছেন, ভাবছেন, কত কি ভাবছেন! হঠাৎ দেখলেন সাদা ধবধবে চারটি পায়রা এলো—এসে তারা বসলো ঘাটের কাণায়, বসেই তারা হয়ে গেল চারটি পরমাসুন্দরী অপ্সর-কন্যা। যেমন তাদের রূপ, তেমনি বসন-ভূষণ।

চার কন্যা জলে নামলো স্নান করতে। স্নান করতে করতে এক কন্যা বললে—কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে স্বর্গ থেকে কোথায় গিয়েছি—তারপর স্বর্গে ফিরবো, স্বর্গের পথ পাচ্ছিনা! এমন স্বপ্ন কেন হঠাৎ দেখলুম, বলতে পারো? আমার কেমন ভয় করছে!

আর তিন কন্যা বললে—স্বপ্ন স্বপ্নই, স্বপ্ন সত্য নয়!

রাজপুত্র শুনলেন তাঁদের কথা! যে কন্যা স্বপ্ন দেখেছে, সে কন্যা সবচেয়ে সুন্দরী! রাজপুত্র ভাবলেন, ঐ কন্যার সঙ্গে যদি আমার বিবাহ হয়!

এ কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্র উঠে দাঁড়ালেন। ওরা না দেখতে পায়, এমনি ভাবে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল দিয়ে তিনি এলেন ঘাটের দিকে। তিনি যখন ঘাটে এলেন, তখন আর তিন কন্যা স্নান সেরে উঠে বসন-ভূষণ পরেছেন, ছোট কন্যা জল ছেড়ে উঠে সিঁড়িতে পা দিয়েছেন, রাজপুত্র এসে খপ করে সে কন্যার হাত ধরলেন। তাঁকে দেখে তিন কন্যা নিমেষে পায়রা হয়ে উড়ে অদৃশ্য হলো—ছোট কন্যা শিউরে উঠলেন,
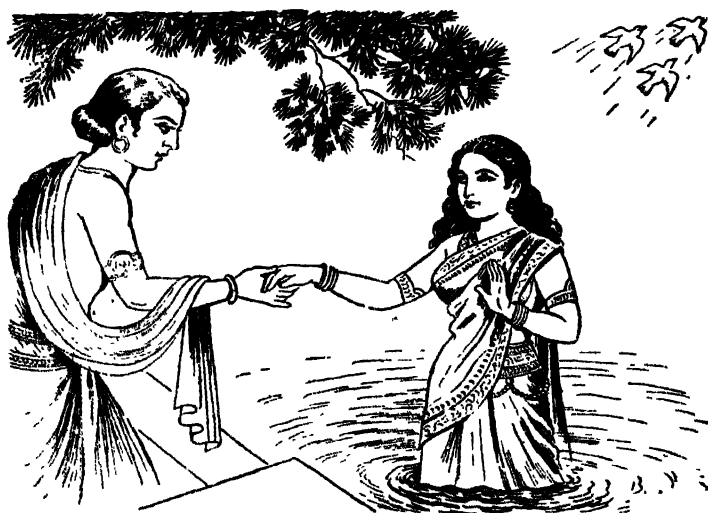
বললেন—কে তুমি? আমাকে ধরলে কেন? আর তো আমি স্বর্গে যেতে পারবো না।

রাজপুত্রের ভারী দুঃখ হলো। তিনি বললেন, না জেনে আমি মহা অন্যায় করেছি!…তুমি কে?

কন্যা বললেন,—আমি দেবকন্যা। আমরা চার জনেই দেবকন্যা। এ দীঘির জল খুব ভালো বলে আমরা রোজ আসি এ দীঘিতে স্নান করতে। পায়রার রূপ ধরে আসি, এসে কন্যা হয়ে স্নান করি—তারপর স্নান সেরে আবার পায়রা হয়ে উড়ে স্বর্গে যাই। তুমি কে?

রাজপুত্র বললেন—আমি মানুষ, রাজপুত্র।

মানুষ—রাজপুত্র! কন্যা অবাক! মানুষ এমন সুন্দর হয়!

রাজপুত্র বললেন—আমাকে তুমি যদি বিবাহ করো, তাহলে আমার সুখের সীমা থাকবে না।

কন্যা বললে—যখন স্বর্গে ফিরতে পারবো না, তখন তাই হোক।

কন্যাকে নিয়ে রাজপুত্র এলেন পুরীতে—দুজনে দুজনের গলায় ফুলের মালা দিলেন। দুজনের বিবাহ হলো।

বিবাহের পর দুজনে মনের সুখে আছেন। রাজপুত্র একদিন বললেন দেবকন্যাকে—পৃথিবী কত সুন্দর—কখনো পৃথিবী দেখেছো?

রাজপুত্র বললেন পৃথিবীর কথা—দেবকন্যা বলেন স্বর্গের কথা।

দেখতে দেখতে আট দিন কাটলো। দৈত্যরাজ পুরীতে ফিরলেন। ফিরে দেবকন্যাকে দেখে দৈত্যরাজ বললেন—বিবাহ হয়েছে, ভালো এখন উৎসব আনন্দের আয়োজন করি।

উৎসব হলো—খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, বাজি পোড়ানো।

তারপর আবার দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, দু' বছর কাটলো।

দেবকন্যা বললেন—রাজপুত্র…

রাজপুত্র বললেন—কি বলছো?

দেবকন্যা বললেন—মা বাপকে অনেক দিন দেখিনি—তাঁদের জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল। পাঁচ-ছ দিনের জন্য স্বর্গে গিয়ে তাঁদের দেখে আসতে চাই!

রাজপুত্র বললেন—তাঁরা যদি আসতে না দেন?

দেবকন্যা বললেন—বাপ মা আমাকে খুব ভালোবাসেন—আমার সুখের জন্য তাঁরা আমাকে আসতে দেবেন—আটকে রাখবেন না।

রাজপুত্র বললেন—কি করে স্বর্গে যাবে?

কন্যা বললেন—দৈত্যরাজকে বললে তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন।

রাজপুত্র বললেন—পাঁচ-ছ দিনের বেশী কিন্তু থেকে না।

দেবকন্যা বললেন—না, না, এখানকার জন্য আমার মন কেমন করবে—পাঁচ ছদিনের বেশী আমি সেখানে থাকতে পারবো না।

দেবকন্যা গেলেন স্বর্গে বাবা মায়ের কাছে। বাবা সেখানকার একজন রাজা। মানুষের সঙ্গে কন্যার বিবাহের কথা শুনে তিনি অগ্নিবর্ণ।

বাবা বললেন—ছি ছি ছি! লজ্জার কথা। দেবকন্যা হয়ে তুচ্ছ মানুষকে বিবাহ করেছিস্। দেবালয়ে আমার মাথা হেঁট করেছিস! তুই আমার দু' চোখের বিষ।

মা বললেন—এখানে কোনো দেবতার সঙ্গে ওর আবার বিবাহ দাও, মানুষের সঙ্গে ও বিবাহ বিবাহই নয়!

কন্যা বললেন—না, আমি কোনো দেবকুমারকে বিবাহ করবো না। যে মানুষকে বিবাহ করেছি, সেই মানুষই আমার স্বামী। আমি তাঁর কাছে ফিরে যাবো।

—বটে, এমন কথা! বলে বাবা কন্যাকে পুরলেন লোহার গারদে। সে গারদের একশো দরজা—সব দরজা শক্ত লোহার তৈরী। প্রত্যেক দরজায় খোলা তলোয়ার হাতে শান্ত্রী খাড়া থাকে। বাবা বললেন—দেখি, কি করে তুমি ফিরে যাও!

তারপর ছ'দিন কেটে গেল—ছদিনের পর দশ দিন! কন্যা ফেরেন না দেখে রাজপুত্র ব্যাকুল হলেন। তাঁর দিনে স্নান নেই, আহার নেই, রাত্রে ঘুম নেই দেখে দৈত্যরাজ বললেন—ব্যাপার কি?

রাজপুত্র তখন দৈত্যরাজকে সব কথা বললেন,—বললেন,—দেবকন্যাকে তাঁর বাবা নিশ্চয় বন্দী করে রেখেছেন—না হ'লে ছ'দিনের দিন তিনি আসতেন। তাঁকে না পেলে আমি এ প্রাণ আর রাখবো না!

দৈত্যরাজ বললেন—কি করে যাবে? গেলেও—যদি তাঁরা তোমায় বন্দী করে রাখে, কি করে খালাস হয়ে আসবে?

রাজপুত্র বললেন—আপনি ব্যবস্থা করে দিন।

দৈত্যরাজ বললেন—বেশ, ব্যবস্থা করছি।

এ কথা বলে রাজপুত্রের হাতে দৈত্যরাজ দিলেন একটি পাগড়ী—খানিকটা কি গুঁড়ো—আর নিজের মাথা থেকে ছিঁড়ে মাথার একগাছি চুল তার হাতে দিয়ে দৈত্যরাজ বললেন—এই পাগড়ী মাথায় থাকলে দেব-গন্ধর্ব কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না—সকলের চোখে তুমি থাকবে অদৃশ্য। আর এই যে গুড়ো—যদি তোমার দু-চোখের পাতায় ও গুড়ো একটু লাগাও, তাহলে তুমি লোহার গারদ, সাগর, পর্বত সব কিছুর ভিতর দিয়ে সব কিছু দেখতে পাবে। আর আমার এই একগাছি চুল—একটু আগুনে ছোঁয়া যদি এতে লাগাও, লাগাবামাত্র লাখে লাখে

দৈত্যসেনার আবির্ভাব হবে। মাথায় পাগড়ী আঁটো—আমি তোমাকে স্বর্গের ফটকে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

স্বর্গে রাজপুত্রকে পৌঁছে দিয়ে দৈত্যরাজ চলে এলেন। রাজপুত্রের মাথায় অদৃশ্য পাগড়ী—দেবতারা কেউ তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না। স্বর্গের পথে অনেকখানি এগিয়ে তিনি দেখতে পেলেন বিরাট একটা পুরী—পুরীর সামনে দাঁড়িয়ে চোখের

পাতায় লাগালেন সেই গুঁড়া। গুঁড়া লাগিয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন—চোখে পড়লো লোহার গারদ—আর সেই গারদের মধ্যে বসে দেবকন্যা হাপুস নয়নে কাঁদছেন।

রাজপুত্র এসে দাঁড়ালেন গারদের দরজার সামনে—ডাকলেন, —দেবকন্যা!

দেবকন্যা চিনলেন এ কণ্ঠস্বর। রাজপুত্রের কণ্ঠ শুনছেন, কিন্তু রাজপুত্রকে দেখতে পেলেন না, শুধু স্বর শুনলেন। দেবকন্যা চারিদেকে তাকাচ্ছেন—

রাজপুত্র বললেন—আমি এসেছি···এখন আমাকে দেখতে পাবে না। আমি তোমাকে গারদ থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবো।

দৈত্যের সেই মাথার চুলে তিনি দিলেন আগুনের ছোঁয়া! অমনি লাখ লাখ দৈত্যসেনার আবির্ভাব। তাঁরা শান্ত্রীদের মেরে গারদের দরজা ভাঙ্গলো—ভেঙ্গে দেবকন্যাকে করলে গারদ থেকে উদ্ধার।

রাজার সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলো না, হঠাৎ দৈত্যসেনার আক্রমণে হেরে গেল দেবকন্যার বাবা রাজপুত্রের হাতে বন্দী হলেন।

রাজপুত্র তখন মাথার পাগড়ী খুললেন—দেবকন্যার বাবা বুঝলেন, মানুষ।

রাজপুত্র বললে—আমি মানুষ···আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করেছি, তার জন্য আপনার উঁচু মাথা হেঁট হয়েছে—কন্যাকে আমার কাছে আর যেতে দেবেন না বলে তাঁকে লোহার গারদে আটকে রেখেছেন। যে মানুষের হাতে আপনার কন্যাকে দিতে আপত্তি—আপনি আজ সেই মানুষের হাতে বন্দী—আপনাকে এখন টেনে নিয়ে গেলে আপনার মাথা খাড়া থাকবে তো! মাথা হেঁট হবে না!

লজ্জায় রাজা মাথা তুলতে পারলেন না তিনি চুপ করে রইলেন।

রাজপুত্র বললেন—আমি তা করবো না। মনে করলে আপনাকে বন্দী করে পৃথিবীতে নিয়ে যেতে পারি! মনে করলে আপনার রাজ্য ছারখার করে দিতে পারি—কিন্তু তা আমি করবো না—কেন না আপনার কন্যাকে আমি বিবাহ করেছি—আপনি এই দেবকন্যার বাবা!

মানুষকে এত তুচ্ছ মনে করেন, এখন দেখলেন মানুষের শক্তি।

দেবকন্যাকে নিয়ে আমি চললুম আমার রাজ্যে। আপনার রাজ্য আপনাকেই দিলুম—আপনাকেও মুক্তি দিলুম।

তাই হলো।

দেবকন্যাকে নিয়ে রাজপুত্র ফিরলেন দৈত্যপুরীতে··· তারপর দৈত্যরাজকে বলে ক'দিনের জন্য দেবকন্যাকে নিয়ে রাজপুত্র এলেন বাপের রাজ্যে।

বৌ দেখে বাপ-মা খুব খুশী।

তারপর থেকে রাজপুত্র আর দেবকন্যা—দু'জায়গাতেই রাজ্য চালনা করেন—ছ মাস থাকেন দৈত্যপুরীতে আর ছ-মাস পৃথিবীতে বাপের রাজ্যে।

যা হবার তা হবেই

এক রাজা। রাজার বিরাট রাজ্য।

রাজা মৃগয়ায় বেড়িয়েছেন—অনেক হাতী, ঘোড়া, লোকজন, সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে।

এ বন সে বন—নানা বন ঘুরে কোথাও কিছু পেলেন না—লোকজন সেপাই-শান্ত্রী রইলো ছাউনিতে! তিনি ফিরলেন না—একলা বেরুলেন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ধূ-ধূ প্রান্তর—তিনি এলেন সেই প্রান্তরে। এ প্রান্তরে জঙ্গল নেই, পাহাড় নেই···খাঁ-খাঁ করছে। রাজা চলেছেন···চলেছেন এগিয়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে সমানে।

যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর পথ আটকে কোথা থেকে এসে দাঁড়ালো এক বিকট রাক্ষসীর মতো মূর্ত্তি!

মূর্ত্তি বললে—দাঁড়াও রাজা।

রাজা মূর্ত্তি দেখে চমকে উঠলেন। তিনি দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হলো রামায়ণের তাড়কা রাক্ষসী যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে!

রাজা বললেন—কে তুমি?

মূর্ত্তি বললে আমি! আমার নাম 'যা হবার তা হবেই'! একদিন তুমি আমাকে ভালো করেই চিনতে পারবে রাজা।

রাজা বললেন—সে দিন কত কাল পরে?

মূর্ত্তি বললে—যদি চাও এখনি সেদিন হতে পারে—আবার যদি বলো, না, এখন নয়, দু-দশ বছর পরে—তাহলে তাও হতে পারে। এখন বলো, কি তোমার ইচ্ছা? এখনি? না, দু'দশ বছর পরে?

রাজা কি ভাবলেন···ভেবে তিনি বললেন—তাহলে আমাকে সাতদিন সময় দাও···আমি রাজ্যে ফিরে রাণীকে জিজ্ঞাসা করে সাতদিন পরে এখানে এসে তোমাকে বলবো।

মূর্ত্তি বললে—বেশ, তাই বলো। সাতদিন পরে তুমি এই এখানে এসো—আমি তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করবো।

এ কথা বলে মূর্ত্তি বাতাসে মিলিয়ে অদৃশ্য হলো। রাজা ঘোড়া ছুটিয়ে রাজ্যে ফিরলেন। লোকজন রইলো ছাউনিতে।

রাজার মুখ মলিন—মন বেশ চিন্তাযুক্ত। রাজার বিমর্ষভাব দেখে রাণী বললেন,—ব্যাপার কি? মলিন মুখ—তোমার হাতী ঘোড়া? লোকজন?

রাজা বললেন রাণীকে সব বৃত্তান্ত। বললেন—যা হবার তা যখন হবেই—এখন তাকে কি বলবো? এখনি তা হোক—না, দু'দশ বছর পরে হোক। তাকে কি বলবো?

রাণী ভাবলেন। ভেবে তিনি বললেন—তাই যখন, আমি বলি মহারাজ,—যা হবার, মানে, যদি মন্দ কিছু হয়—তাহলে তা এখনি হোক্—আমরা জোয়ান আছি। মন্দ হলে ছেলে-মেয়েদের দেখতে পারবো। আরও দু'দশ বছর পরে যদি হয়, যদি আমরা বেঁচে না থাকি, ছেলেমেয়েদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকবে না।

রাজা বললেন—তাহলে সাতদিনের দিন আমি যাই—গিয়ে তাকে এ কথা বলবো। বলবো, যা হবার তা এখনি হোক—এই আমার ইচ্ছা।

রাণী বললেন—হ্যাঁ মহারাজ।

সাতদিনের দিন রাজা সেই মাঠে গিয়ে দেখেন, সে মূর্ত্তি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

মূর্ত্তি বললে—কি তোমার ইচ্ছা, বলো?

রাজা বললেন—যা হবার, তা এখনি হোক।

—বেশ।

সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তি হলো অদৃশ্য।

রাজা রাজ্যে ফিরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে সওয়ার দূত এসে খবর দিলে,—বহু সৈন্য নিয়ে শত্রু আসছে রাজ্য আক্রমণ করতে। তারা সীমান্তে এসে পড়েছে।

শুনে রাজা চমকে উঠলেন। তাইতো, যা হবার তা হবেই!

তা বলে এত শীঘ্র! তিনি হুকুম দিলেন—সেনাপতি, সেনা সাজাও।

সৈন্যসামন্ত সাজলো—শত্রু সৈন্য এলো হুড়মুড় করে—বন্যার মতো। শত্রু সেনার সামনে রাজার সেনারা দাঁড়াতে পারলো না। অনেক সেনা মরে গেল···অনেকে হলো শত্রুর হাতে বন্দী।

রাজা-রাণী তাড়াতাড়ি তাঁদের দুই পুত্র আর দুই পুত্রবধূকে নিয়ে পুরীর খিড়কির ফটক খুলে ছ-ছটা ঘোড়ায় চড়ে ধনদৌলত যা পারলেন, নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করে চললেন।

অন্ধকার রাত্রি—শত্রুরা রাজ্য জয় করে আমোদ আহ্লাদ করছে—তারা জানতেও পারলো না, রাজা-রাণী পুরী ত্যাগ করে পালিয়েছেন।

পুত্র-পুত্রবধূদের নিয়ে রাজা রাণী বন জঙ্গল ভেদ করে কত গিরি নদী পার হয়ে অনেক দূরে এলেন।

রাজ্য ছেড়ে অনেকদূরে এসে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, মাঠে ঘাটে থাকেন—কোনো শহরে থাকেন না। ধনদৌলত যা সঙ্গে এনেছিলেন, তা ফুরিয়ে গেল। দীন-দুঃখীর মত বাস করেন।

এখান-ওখান করে সাত-আট মাস কাটলো। রাণীর আর পুত্রবধূদের গহনা গাঁটি বেঁচে দিন চালান। এ-সবও যখন নিঃশেষ হলো, তখন মহা দুশ্চিন্তা—এখন কি করে দিন চলবে।

বৌ দুটি ভারী ভালো। বড়র নাম চম্পা, ছোটর নাম শম্পা। রাজা-রাণী বললেন—তোমরা তোমাদের বাপের কাছে

যাও! আমাদের যা হবার, তা হয়েছে—তোমরা কেন আমাদের সঙ্গে থেকে দুঃখ পাও?

চম্পা-শম্পা বলে,—শ্বশুরবাড়ীর এমন দুর্দশা, বাপের বাড়ীতে কি মান-ইজ্জৎ থাকবে? বাপের বাড়ী গিয়ে সকলের দয়ার উপর নির্ভর করে থাকতে পারবো না।

তারা কিছুতে যাবে না। দুই ছেলে বললে—আমরা জোয়ান মানুষ—তোমাদের যে পুঁজি আছে তাতে তোমরা চালাও, আমরা দুজনে কাজকর্ম করে খাবো। তারপর বরাত যদি ফেরে আবার সকলে মিলে-মিশে থাকবো।

দুই রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে সকলকে ত্যাগ করে কাজকর্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

এখন এঁরা চারজন…চম্পা, শম্পা, রাজা ও রাণী—রোদে-জলে ঘুরচেন…মাঠে-বাটে শুয়ে থাকেন—তার উপর পেট ভরে দু'জনে খেতে পান না—এই দুঃখই রাজা-রাণীর মনে কাঁটার মতো বেঁধে। তাঁরা বারবার বলেন, তোমরা নিজের নিজের বাপ-মার কাছে যাও মা! চম্পা-শম্পা কিছুতে তা করবেন না। তারা বলেন,—না, আমাদের কোন কষ্ট হচ্ছে না—আপনাদের সঙ্গে আছি…আমরা ভালোই আছি।

রাজা-রাণী তখন করলেন কি—রাত্রে চম্পা-শম্পা যখন ঘুমোচ্ছেন,—রাজা-রাণীর চোখে ঘুম নেই। বেনারসী চাদরে তাঁরা একরাশ মোহর বাঁধলেন—আর কিছু পোশাক-আশাক রাখলেন—তাঁদের মাথার কাছে রাখলেন দুখানি তলোয়ার। তারপর একখানি চিঠি লিখলেন। চিঠিতে লিখলেন—

দুঃখ করো না মা। আমাদের বরাত দোষে তোমরা কেন মিথ্যা এত কষ্ট পাবে? আমরা চললুম—তোমাদের নিজের

বরাতের গুণে তোমরা যদি সুখী হও, তাহলে আমাদের কোনো দুঃখ থাকবে না—জেনো।

এ চিঠি লিখে চম্পার-শম্পার মাথার নীচে রাখলেন—চম্পার-শম্পার জন্য দুটি ঘোড়া রাখলেন; তারপর রাজা-রাণী নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে গেলেন।

রাতের পর সকাল হলো। ঘুম ভেঙ্গে চম্পা-শম্পা দেখেন, রাজা-রাণী নেই—তাঁদের ঘোড়া দুটিও নেই—মাথার নীচে পেলেন তাদের নামে খোলা চিঠি।

চিঠি পড়ে চম্পা-শম্পা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল; তারপর চম্পা বলল,—এখন উপায়? কোথায় তাঁদের খুঁজবো? যেদিকে দুচোখ যায়, আমরা যাবো।

পোশাকের মধ্যে পাওয়া গেল রাজপুত্রের একটা পোশাক। চম্পা বলল—এ পোশাক পরে আমি সাজবো পুরুষমানুষ—তুমি আমার ছোট বোন—তাহলে পথে বিপদের ভয় থাকবে না।

তাই হলো। চম্পা সাজল পুরুষ…রাজপুত্র—শম্পা তার বোন—দু'জনে দুটি ঘোড়া নিয়ে বেরুল নিরুদ্দেশের পথে।

ঘুরতে ঘুরতে রাজা-রাণীর সন্ধান মিললো না। দুজনে ঘুরতে ঘুরতে এল এক রাজ্যে। এখানে ছোট একটি বাড়ী নিয়ে শম্পাকে বাড়ীতে রেখে চম্পা এল রাজপুত্রের বেশে সেখানকার রাজার সভায়—তার হাতে তলোয়ার।

তার চেহারা দেখে দ্বারী পথ আটকালো না। চম্পা এল রাজার সভায়—রাজার সামনে।

সুন্দর চেহারা দেখে রাজার মমতা হলো। রাজা বললেন—কে তুমি? কি চাও?

চম্পা বলল—আমি চাকরি চাই, মহারাজ।

রাজা বললেন,—যদি ভালো চাকরি পাও, করবে?

চম্পা বললে—নিশ্চয় করবো মহারাজ।

রাজা বললেন—বেশ, আজ থেকে হবে আমার দেহরক্ষী।

কাজ ভারী নয়—মাহিনা মোটা। কাজে রাজাকে খুশী করবার জন্য চম্পার প্রাণপণ চেষ্টা। পাহারাদারীর কাজে চম্পা সব সময়ে খুব হুঁশিয়ার। তাঁর কাজে রাজা খুব খুশী হলেন—মন্ত্রী-সভাসদ সকলে তাকে ভালবাসেন।

এ রাজ্যের নিয়ম, চোরডাকাতকে গাছে লটকে ফাঁশি দেওয়া হয়। শহর থেকে অনেক দূরে মশান—সেই মশানে গাছে লটকানো হয়। সেদিন সন্ধ্যার সময় চম্পা রাজার কাছে পাহারাদারী করছে…এমন সময় এক ডাকাতকে নিয়ে যাওয়া হলো গাছে লটকে তাকে ফাঁসি দেবার জন্য।

সেদিন মাঝরাত্রে চম্পা তাঁর বাড়ীতে ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ বিকট কান্না শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কী বুকফাটা কান্না! স্ত্রীলোকের কান্না!

চম্পা স্থির থাকতে পারল না—তখনি তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চম্পা চলল অরণ্যের মশানে।

সেখানে পৌঁছে দেখে, গাছের ডালে ফাঁশির দড়িতে ঝুলছে সেই ডাকাত, আর তার পায়ের নীচে দাঁড়িয়ে একটি স্ত্রীলোক—সেই ডাকাতের দিকে চেয়ে ডাক ছেড়ে চ্যাঁচাচ্ছে।

ঘোড়া থেকে নেমে চম্পা তার কাছে গেল, বলল—কে তুমি?

স্ত্রীলোক বললে,—ও আমার ছেলে—আমি একবার ছেলের মুখে চুমু খেতে চাই! কিন্তু বুড়ো মানুষ, ছেলের

নাগাল পাচ্ছি না। তুমি যদি দয়া করে তোমার কাঁধে আমাকে তুলে ধরো— তাহলে আমি জন্মশোধ ছেলেকে চুমু খাই।

এখন এই স্ত্রীলোকটি মানুষ নয়, রাক্ষসী। সে এসেছে। মশানে ফাঁশির শবের রক্ত খেতে! চম্পা কি করে তা বুঝবে? ভাবলে, আহা, নিই কাঁধে তুলে—যদি ওর সাধ মেটে!

চম্পা তাকে কাঁধে তুললেন। রাক্ষসী চম্পার কাঁধে উঠে নাগাল পেলো ডাকাতের গলা– অমনি তার ঘাড় মটকে চক্‌চক্ করে রক্তপান করিতে লাগলো। এক ফোঁটা রক্ত পড়লো চম্পার গায়ে। চম্পা তখন বুঝল ব্যাপার—কাঁধ থেকে তাকে ধুপ করে মাটীতে ফেলল—ফেলেই তলোয়ারের এক চোট্ তার গায়ে—রাক্ষসীর গায়ে চোট লাগলো না– সে পালালো; কিন্তু তলোয়ারের ঘায়ে রাক্ষসীর আঁচলের খানিকটা কেটে রইলো।

আঁচলের কাটা টুকরোটা নিয়ে চম্পা ফিরল। বাড়ী এসে চম্পা দেখল শাড়ীর আঁচল—অনেক দামী শাড়ীর আঁচল—আগাগোড়া সোনার সূতোয় তৈরী—রাজা-রাজড়ার ঘরেও এমন দামী শাড়ী নেই।

পরের দিন সকালে চম্পা এল রাজার কাছে। রাজা বললেন— এত দেরী কেন?

চম্পা বলল রাজাকে রাত্রের বিবরণ—সঙ্গে সঙ্গে দেখাল তলোয়ারের চোটে কাটা আঁচলের টুকরো।

রাজা আঁচল দেখে অবাক! বললেন,—এমন শাড়ী দুর্লভ — এর দাম কত মোহর— আমি তা বলতে পারবো না।

তিনি চম্পাকে দিলেন একরাশ মোহর; আঁচলের টুকরোটা দিলেন রাণীকে।

রাণী আঁচলের টুকরো দেখে অবাক। তিনি বললেন—আঁচল নিয়ে কি করবো? এই সোনার সুতোয় বোনা প্রমাণ শাড়ী আমার চাই।

রাজা তখন চম্পাকে বললেন—রাণী এই সুতোয়-বোনা শাড়ী চান। যেমন করে পারো যেখান থেকে পাও, এই সুতোয় বোনা একখানি শাড়ী এনে দিতে হবে রাণীর জন্য।

চম্পার মনে হলো, সর্ব্বনাশ! সে বলল—কোথায় থাকে সে রাক্ষসী, কোথায় তাকে পাবো! কি করে এ শাড়ী আনবো?

রাজা বললেন—ও কথা আমি শুনবো না। এ শাড়ী যদি আনতে পারো, তোমায় খুশী করবো—বখ্‌শিস দেবো—আর যদি আনতে না পারো, তাহলে তোমার গর্দানা যাবে।

চম্পা বলল—তাই হবে, মহারাজ।

রাজা বললেন—তুমি যত টাকা চাও খরচের জন্য, নাও… আর এ শাড়ী আনবার জন্য এক মাস সময় দিলুম!

পরের দিন সকালে রাজার কাছে বিদায় নিয়ে চম্পা বেরুল সেই রাক্ষসীর শাড়ীর সন্ধানে।

এ রাজ্য, ও রাজ্য, নানা রাজ্য ঘুরে চম্পা এল এক রাজ্যে। এ রাজ্যে এসে চম্পা দেখল তেমন লোকজন নেই, বাড়ীঘর সব খালি—সামান্য ক'জন মানুষ—যারা এখানে আছে তারা দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে আছে।

এখানে এক বুড়ীর সঙ্গে দেখা—বুড়ী আর তার সঙ্গে বসে আরো দুটি মেয়ে একরাশ আটা মাখছে—চম্পা আরো দেখল যে বুড়ীর দু'চোখে জলধারা।

চম্পা বললে—কাঁদছো কেন বুড়ীমা? আর অত আটা মাখছো—বাড়ীতে কি খাওয়া দাওয়া আছে?

বুড়ী বললেন,—না বাবা, আমাদের বিপদের কথা কি আর বলবো !···ফী হপ্তায় রাত্রে একটা রাক্ষস আসে এ সহরে··· সহরের শেষে বনের ধারে পাতার একখানা ঘর—তাকে হপ্তায়-হপ্তায় সে-ঘরে দিতে হয় এক মণ আটার রুটি—আর তার সঙ্গে একটা করে ছাগল—আর এক এক বাড়ী থেকে একজন করে মানুষ। আজ আমার বাড়ী থেকে রুটি যাবে—ছাগল যাবে—আর একজন মানুষকে দিতে হবে। আমার বাড়ী থেকে যাবে আমার ছেলে—তাই মনের দুঃখে আমি কাঁদছি বাবা।

চম্পা বলল—তুমি কেঁদো না বুড়ীমা—তোমার ছেলেকে যেতে হবে না। ছেলের বদলে আমি যাবো।

বুড়ী বললে—তা কি হয়! পরের বাছা—তুমি কেন যাবে ?

চম্পা বললে—কোনো দুঃখ করো না। ও রাক্ষসকে আমি শেষ করে দেবো।

বুড়ী বললে,—রাজার ঘোষণা—ও রাক্ষসকে যে মারবে, তাকে তিনি হাজার মোহর দেবেন—আর এক কন্যার সঙ্গে দেবেন তার বিবাহ।

—কেউ এ রাক্ষসকে মারবার চেষ্টা করে না ?

—না বাবা। বুড়ী বললে।

চম্পা বলল—এখনি আমি দেখতে চাই কোথায় রাক্ষস আসে রাত্রে—সে জায়গায় যাবো।

রুটি তৈরি হলে বুড়ীর ছেলে চললো সেই রুটি আর একটা ছাগল নিয়ে। তখন দুপুরবেলা।

চম্পা চলল তার সঙ্গে।

সহরের শেষে বনের গায়ে চালা-ঘর। চম্পা ভালো করে

দেখল সে চালা। ঘর দেখে ছাগলটাকে বেঁধে রাখল দাওয়ার একধারে—তারপর মাটীর বড় একটা পুতুল তৈরী করে সে পুতুলকে জামা-কাপড় পরিয়ে আর একধারে রাখল দাঁড় করিয়ে; তারপর পুতুলের কাছে দাওয়ায় একটা গর্ত্ত খুড়ে সেটা রাখল তক্তা চাপিয়ে বুজিয়ে।

এ সব করতে সন্ধ্যা হলো। তখন বুড়ীর ছেলেকে বিদায় দিয়ে গর্তের মধ্যে নামল চম্পা...হাতে খোলা তলোয়ার। গর্ত্তে দাঁড়িয়ে সে প্রহর গুণতে লাগল—কখন রাক্ষস আসে।

তারপর মাঝরাত্রি....বাহিরে ভারী পায়ের শব্দ...জোর নিশ্বাসের শব্দ...। চম্পা বুঝল, দৈত্য এসেছে। সে তৈরী হয়ে রইল। রাক্ষস এসে ছাগলটাকে ধরলো—ছাগলটা ব্যা ব্যা করে ডেকে উঠলো—তারপর একটা ঢেকুর—তারপর একটা ঢেকুর—তারপর রুটির কাঁড়ি গেলা...

রুটিগুলো খেয়ে রাক্ষস এবার পুতুলটাকে মানুষ মনে করে খাবে---গর্ত থেকে মাথা তুলে তাকে তাগ করে চম্পা মারল তলোয়ারের কোপ। হাঁটু থেকে রাক্ষসের পা কেটে পড়লো। চীৎকার করে সঙ্গে সঙ্গে কাটা পা রেখে রাক্ষস দে দৌড়।

চকিতে সে অদৃশ্য হলো। চম্পা উঠল গর্ত থেকে। উঠে দেখে পুতুলটা পড়ে গেছে...রাক্ষসের কাটা পা আছে তার পাশে পড়ে!

সেই কাটা পা নিয়ে চম্পা ফিরল সকালে বুড়ীর বাড়ীতে। ফিরে কাটা-পা দেখিয়ে চম্পা বলল—আর ভয় নেই বুড়ীমা রাক্ষসের একখানা পা দিয়েছি কেটে---সে আর এ রাজ্যের ত্রিসীমা মাড়াবে না। তোমাদের আর কোন ভয় রইলো না।

শহরের লোকজন শুনলো। শুনে কারো বিশ্বাস হয় না!

শেষে রাক্ষসের কাটা পা দেখে সকলের মুখে ধন্য ধন্য রব। সকলে বলতে লাগলো, বাহাদুর ছেলে বটে!

রাজা শুনলেন এ খবর। তিনি তখনি লোক পাঠিয়ে চম্পাকে সভায় আনলেন। রাজা বললেন—কি করে তার পা কাটলে?

চম্পা বলল সে কাহিনী। শুনে রাজা মহাখুশী। তিনি বললেন—আমার ঘোষণা, রাক্ষসকে যে মারবে তার সঙ্গে আমার একটি কন্যার বিবাহ দেবো। এখন দয়া করে তুমি আমার বড় মেয়েটিকে বিবাহ করো।

চম্পা দেখল—মুস্কিল। চম্পা বলল—এখন ক্ষমা করবেন মহারাজ—আমি চলেছি বিশেষ কাজে। এখন বিবাহ করতে পারবো না। কাজ সেরে ফিরে এসে আপনার কন্যাকে আমি বিবাহ করবো।

রাজা কি করেন—নিরুপায়। চম্পাকে অনেক খাতির যত্ন করলেন। পরের দিন সকালে চম্পা বেরুল গিরি-বন লঙ্ঘন করে সেই রাক্ষসীর সন্ধানে।

পাহাড় পার হয়ে পাহাড়ের কোলে একটা ভাঙ্গা গড়—আর এক রাজ্যের গড়—চারিদিকে পাথরের পাঁচিল। একটা ফাটল দিয়ে পাঁচিল টোপকে চম্পা এল ফটকের সামনে। এসে দেখে, একটি মেয়ে বসে চরকায় সূতো কাটছে—কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই!

চম্পাকে দেখে মেয়েটি প্রথমে হা-হা করে হেসে উঠলো, তারপর ভয়ে সে তুললো চীৎকার।

চম্পা অবাক। চম্পা বলল, আমাকে দেখে প্রথমে হাসলে। তারপর শিউরে চীৎকার করলে—এর অর্থ কি?

মেয়েটি বললে—জন্মে অবধি আমি কোনো মানুষের মুখ দেখিনি তাই তোমাকে দেখে খুশী হয়ে হেসেছি—তারপর শিউরে চীৎকার করলুম তার কারণ, এ পুরীতে থাকে রাক্ষস—সে তোমাকে দেখতে পেলে এখনি খাবে !

চম্পা বলল—এখানে কটা রাক্ষস আছে ?

মেয়েটি বললে—দু'জন। রাক্ষস আর রাক্ষসের বৌ রাক্ষসী।

চম্পা বলল—এখান থেকে কোনো মতে পালাতে পারবো না ?

মেয়েটি বললে—আজ একটা রাত কোনমতে তোমাকে রক্ষা করতে পারবো—তার বেশী আর একদিনও তা পারবো না।

মেয়েটা তখন চম্পাকে নিয়ে একধারে এক নির্জন ঘরে এলো। তাঁর খাবার দিলে, জল দিলে, তারপর ঘরের দরজা তালাবন্ধ করে সে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে তার চরকা নিয়ে বসলো।

তার পর সন্ধ্যা হলো—রাক্ষস-রাক্ষসী ফিরলো। সঙ্গে তাদের হরিণ আর ছাগল। এসেই তারা খেতে বসলো; মেয়েটির জন্য খাবার এনেছিল—তাকে দিলে তার খাবার।

তারপর খেতে খেতে দুজনে কথা—

রাক্ষস বললে-এই মেয়েটা যখন নেহাৎ বাচ্চা, তখন ওকে চুরি করে এনে পালন করছি। মেয়ে ডাগর হলো—এখন বেশ জোয়ান আর সাহসী মানুষের সঙ্গে ওর বিবাহ দিতে চাই।

রাক্ষসী বললে—তা যদি বলো—আমি দেখেছি এমন জোয়ান বীর পাত্র। মশানে সে আমাকে কাঁধে তুলেছিল, তার পর তলোয়ারের একটি কোপে আমার শাড়ীর খানিকটা আঁচল কেটে দিয়েছিল।

রাক্ষস বললে—আরে ধেৎ! ওর চেয়েও সাহসী বীর আমি দেখেছি—আমার একখানা পা হাঁটু থেকে কেটে উড়িয়ে দিয়েছিল।

দু'জনে মিলে তখন তর্ক—কে বেশী বীর? যে রাক্ষসীর শাড়ীর আঁচল কেটেছিল সে, না, যে রাক্ষসের পা কেটেছিল? তর্ক করতে করতে তর্ক শেষ হলো না দুজনে ঘুমিয়ে পড়লো।

রাতের পর সকাল হলে রাক্ষস আর রাক্ষসী বেরিয়ে গেল শিকার করতে। মেয়েটি তখন সে ঘরের তালা খুলে চম্পাকে বার করে নিয়ে এলো—এসে তাকে বললে, রাত্রে রাক্ষস-রাক্ষসীর যে কথা হয়েছিল, সেই কথা।

মেয়েটি বললে—আমি কিন্তু তোমাকে বিবাহ করবো।

—রাক্ষস রাক্ষসী যদি তাতে আপত্তি করে?

মেয়েটি বললে—রাক্ষসী একবার মানুষের রক্ত খেতে গিয়েছিল, ফিরে এলো,—তার শাড়ীর আঁচল কাটা। বললে, একজন মানুষ তলোয়ারের এমন কোপ মেরেছিল--কোপ তার গায়ে লাগেনি, শাড়ীতে লেগে শাড়ীর আঁচলের খানিকটা কেটে বেরিয়ে গেছে। রাক্ষসেরও বিপদ গেছে—কোথায় কোন রাজ্যে গিয়েছিল মানুষ খেতে—সেখানে এক মানুষের তলোয়ারের একটি কোপে তার একখানা পা কেটেছে—হাঁটু থেকে নীচের পা। দুজনে রাত্রে তাই তর্ক হচ্ছিল—রাক্ষসী বললে, যে-মানুষ তার শাড়ীর আঁচল কেটেছে, তার মতো বীর আর নেই। রাক্ষস বললে—যে তার পা কেটেছে, সেই হলো বড় বীর। দু'জনেই চায় বীরের সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে।

চম্পা শুনল—শুনে মনে মনে খুশী হলো। সে তখন বলল যে তার তলোয়ারের ঘায়েই রাক্ষসীর শাড়ীর আঁচল কেটেছে—আর তার তলোয়ারের কোপেই রাক্ষসের পা কেটেছে।

চম্পা বলল, তাহলে আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবে ওরা ?

মেয়েটি বললে—দেবে।

তারপর সারাদিন কাটলো গড় ঘুরে—গড়ের ঘর দেখে আর রত্ন-ভাণ্ডার দেখে। সন্ধ্যা হলে মেয়েটি আবার চম্পাকে রাখলো সেই নির্জন ঘরে তালা বন্ধ করে।

রাত্রে রাক্ষস-রাক্ষসী ফিরলো ফিরে বেশ জাঁকজমকে চললো তাদের ভোজ তারপর দুজনে আবার মেয়েটির বিবাহের কথা। বীর-পাত্র নিয়ে দু'জনে তর্ক। মেয়েটি চুপ করে থাকতে পারলো না। মেয়েটি বললে—যদি ঐ একটি লোকই এই দু'কাজ করে থাকে ? তাকে পেলে দেবে তার সঙ্গে তোমরা আমার বিবাহ ?

রাক্ষস-রাক্ষসী বললে—নিশ্চয়।

মেয়েটি বললে—তাকে যদি পাও, মেরে খাবে না ?

—না, না, না। রাক্ষস-রাক্ষসী দুইজনেই তিন সত্য করলে।

মেয়েটি তখন গেল সেই নির্জন ঘরে—সেখানে গিয়ে চম্পাকে এ কথা বললো ; বলে চম্পাকে সে ঘর থেকে নিয়ে এলো রাক্ষস-রাক্ষসীর সামনে।

চম্পাকে দেখে রাক্ষস বললে—কি করে তুমি আমার পা কেটে ছিলে ?

রাক্ষসী বললে—আর আমার শাড়ীর আঁচল কেটেছ কি ভাবে ?

চম্পা বললে দু'জনকে সে কাহিনী।

এ কথা বলে চম্পা দেখালে তকতকে কাটা পা আর শাড়ীর কাটা আঁচল। এ দুটি জিনিষ সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

শুনে রাক্ষস-রাক্ষসী অবাক! তারা বললে—হাঁ, সাহস বটে! বুদ্ধি বটে!

তারা তখন বললে—এ মেয়েটি হলো রাজার কন্যা। ওর বাপের রাজ্যে কাকেও আমরা রাখিনি—মেয়েটি তখন ছোট, মায়া হলো, তাই একে এনে নিজেদের মেয়ের মতো পালন করছি। একে তুমি বিবাহ করো—আমাদের মোহর আছে, মণিরত্ন আছে। আমরা তা দিয়ে কি করবো? সে সব তোমাদের দুজনকে দেবো।

চম্পা বলল—কিন্তু তার আগে আমাকে একটি কাজ করতে হবে।

—বলো, কি কাজ ?

শাড়ীর কাটা আঁচল দেখিয়ে চম্পা চলল—এই সূতোর প্রমাণ একখানি শাড়ী আমার চাই ?

রাক্ষসী বললে—তাতে কি ? এমন শাড়ীর কি অভাব আছে! এখনি দিচ্ছি।

রাক্ষসী তখনি দিলে সেই জাতের সোনালি সূতোয় বোনা প্রমাণ শাড়ী।

তারপর বিবাহ হলো। বিবাহের পরে চম্পা বললে—আমি এবার বাড়ী যাবো।

রাক্ষস রাক্ষসী দিলে অনেক অনেক ধন-রত্ন আর এমনি রাক্ষ-,

দু'জনেই

শাড়ী অনেকগুলো। সে সব নিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে চম্পা ফিরল বাড়ীর পথে—রাক্ষস-রাক্ষসী তাদের সঙ্গে এলো তাদের রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত।

মেয়েটিকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বহুদিন পরে চম্পা এল সেই রাজ্যে—যে রাজ্যে রাক্ষসের পা কেটেছিল। সঙ্গে রাক্ষস-রাক্ষসীর দেওয়া মোহর মণি রত্ন আর শাড়ীর বস্তা।

এখানে চম্পাকে বিবাহ করতে হলো রাজার কন্যাকে—রাজা দিলেন অনেক মোহর, মণি, রত্ন, ঘোড়া। তারপর দুই বৌ দুই ঘোড়ার পিঠে—চম্পা তার ঘোড়ার পিঠে…দুই বৌকে নিয়ে এল যে-রাজ্যের রাজার কাছে চাকরি করছে, সেই রাজ্যে।

এ রাজ্যে পৌঁছে নিজের বাসায় শম্পার কাছে জিনিষ-পত্র আর দুই বৌকে রেখে চম্পা এল শাড়ী নিয়ে রাজপুরীতে রাজার সভায়।

শাড়ী দিল রাজার হাতে। রাজা শাড়ী পেয়ে যেমন অবাক, তেমনি খুশী। শাড়ী পেয়ে রাণীর আনন্দের সীমা নেই।

চম্পাকে রাজা বললেন,—আজ থেকে তুমি আর আবার দেহরক্ষী নও—আমার প্রধান মন্ত্রী হলে। তোমাকে দেবো পুরী, লোকজন আর অনেক মোহর।

চম্পা এল নূতন পুরীতে বাস করতে। এ পুরীতে নিয়ে এল শম্পাকে আর দুই বৌকে।

এখন একটি মাত্র চিন্তা—শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী আর দ্যাওরের সন্ধান। ঘোড়ায় চড়ে এখানে-ওখানে ঘোরে—বনে-পর্বতে ঘোরে কিন্তু তাঁদের কোনো সন্ধান পায় না।

শেষে একদিন রাজাকে চম্পা বললে—আমি একখানি

বাগান করতে চাই—সে বাগানে সব রকম ফল-ফুলের গাছ থাকবে।

রাজা বললেন—বেশ।

তিনি দিলেন চম্পাকে অনেক জমি। সে জমিতে চম্পা বাগান তৈরি করতে লাগল। সে বাগানে নানা দেশের ফল-ফুলের গাছ থাকবে—তাই দেশে দেশে লোক পাঠালো হলো—ভালো ভালো গাছ জোগাড় করে আনবার জন্য—প্রত্যেকটি গাছের জন্য সে দেবে দশ দশ মোহর।

এ কথা ঢ্যাড়া দিয়ে ঘোষণা করা হলো। চম্পার মনে হলো—শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী-দ্যাওর সকলে কত না দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করছেন—এ ঘোষণা শুনলে মোহরের জন্য হয়তো তাঁরা গাছ নিয়ে আসবেন একদিন।

দিন যায়…মাস যায়…চম্পার মনের আশা পূর্ণ হয় না। সে আছে খুব মনের দুঃখে। এত ঐশ্বর্য—তার মন তাতে খুশী নয়।

তারপর একদিন শ্বশুর রাজা…অতি কষ্টে তাঁর দিন কাটে—তিনি শুনলেন এ ঘোষণার কথা—বনে বনে তিনি ঘোরেন রাণীর সঙ্গে—ছেলে দুটিও এখন সঙ্গে থাকে। দুই ছেলে আর তিনি খুঁজে খুঁজে পেলেন অনেক গাছ—পাহাড়ী ফুলের গাছ। এ গাছ সহজে পাওয়া যায় না। গাছ নিয়ে রাজা-রাণী, রাজার দুই পুত্র অতি জীর্ণ বেশে মোহর পাবার প্রত্যাশায় এলেন এ রাজ্যে রাজার কাছে।

চম্পার পুরুষবেশ—রাজবেশ—তাঁরা চম্পাকে চিনলেন না; কিন্তু চম্পা চিনলেন চার জনকেই।

চম্পা পরিচয় দিল না; তাঁদের চিনেছে এভাব প্রকাশ

করল না—শুধু লোকজনকে হুকুম দিল—এ চারজনকে নির্জন পুরীতে রাখতে। সে পুরীর দরজায় শান্ত্রী পাহারা মোতায়েন থাকবে—এঁরা যেন সে পুরী থেকে না বেরুতে পারেন।

তাই হলো। তাঁরা অবাক! এ ঘরের পাশে এসে দেয়ালে কান পেতে দাঁড়াল চম্পা—ওঁরা কি কথাবার্ত্তা বলেন, শুনবে বলে।

প্রথমেই শুনলে শ্বশুর রাজার কথা। তিনি বললেন—আশ্চর্য বরাত! যে গাছ এনে অপরে মোহর পাচ্ছে—আমরা সেই গাছ এনে হলুম বন্দী।

রাণী বললেন—ভগবান আমাদের সাজা দিতে চান—ছুই বৌকে নিষ্ঠুরের মতো বনে ত্যাগ করে এসেছি—এ কি সামান্য অপরাধ!

এ কথা শুনে চম্পা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না—ঘর থেকে বেরিয়ে লোকজনকে হুকুম দিল—ওঁদের নিয়ে এসো দোতলায় ঘরে। তাঁরা এলে ওঁদের স্নানের ব্যবস্থা করে—স্নানের পর ওঁদের দেবে ভালো দামী পোষাক আর আমার ঘরে ওঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা করো—বিরাট ভোজ।

ওঁদের স্নান হলো—ভালো পোষাক পরে ওরা এলেন চম্পার খাবার ঘরে। চমৎকার সাজানো—সেই ঘরে সোনার পাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জন···চারজনে খেতে বসলেন।

তাঁরা বসে খাচ্ছেন—সে ঘরে এল চম্পা—পুরুষ বেশে। চম্পা এসে কাছে একখানা আসনে খেতে বসে বলল—আপনাদের দেখে খুব বোনেদী ঘরের মানুষ বলে মনে হচ্ছে—তা আপনাদের এত দুর্দশা হলো কেমন করে, বলবেন?

রাজা বললেন—একদিন আমি ছিলুম এক রাজ্যের রাজা,—ইনি রাণী আর এঁরা দুজন আমাদের পুত্র। দুই পুত্রের

বিবাহ হয়েছিল—দুটি বৌ রূপে গুণে লক্ষ্মী! তারপর ভাগ্যের বিপর্যয়। শত্রু এসে হঠাৎ অতর্কিত করলো রাজ্য আক্রমণ—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলুম না—হারলুম। শত্রু রাজ্য ছারখার করতে লাগলো—তখন ক'জন প্রাণ রক্ষার জন্য গভীর রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে রাজ্য ত্যাগ করে পথে বেরুলুম। পথে পথে বহুদিন নানা দুর্ভোগ। শেষে অন্ন জোটে না। ছেলেরা বললে, তারা জোয়ান—কাজকর্ম করবে—আমাদের কাঁধে বোঝা হয়ে থাকবে না। তারা চলে গেল। তখন বৌ দুটিকে নিয়ে মহা দুশ্চিন্তা···তাঁরা রাজার কন্যা। বললুম, নিজের নিজের বাপের কাছে যাও। তাঁরা রাজী হলেন না—সঙ্গে রইলেন। তাঁদের কষ্ট সহ্য হলো না। মনে হলো, আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের মন্দ-ভাগ্যের জন্য ওঁরা কেন কষ্ট পান—তাই ওঁদের ভাগ্যের ওপর ওঁদের ভার চাপিয়ে একদিন যাত্রা করলুম। তারপর থেকে শুধু দুঃখই পাচ্ছি।

চম্পা বলল—যে যার নিজের ভাগ্যে সুখ-দুঃখ ভোগ করে, এই কথা ভেবেই আপনার বৌ দুটিকে অসহায় অবস্থায় বনে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন?

—তাই।

চম্পা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—তারপর পুরুষ বেশ ত্যাগ করে এতকাল পরে নিজের বেশ পরে মেয়ে হল।

মেয়ে হয়ে শম্পার হাত ধরে সে ঘরে এল। এসে চম্পা বলল—যে ভাগ্যের উপর নির্ভর করে আমাদের ত্যাগ করে গিয়েছিলেন, এখন সেই ভাগ্যই আমাদের আবার একত্র মিলিয়ে দিলে আজ।

তখন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল; রাজা-রাণী—দুই রাজপুত্রে

এদের বিস্ময়ের সীমা নেই! তাঁরা শুধু দৈন্য দুর্দশা ভোগ করছিলেন—আজ চম্পা-শম্পা তাদের দিয়েছেন ঐশ্বর্য।

চম্পা বলল আগাগোড়া বৃত্তান্ত। শুনে তাঁরা বললেন—ভাগ্য—শুধু ভাগ্যের লীলা।

দুটি নতুন বৌ···চম্পা বলল—একজনকে বিবাহ করবেন বড় রাজপুত্র—আর একজনকে ছোট রাজপুত্র। আমি আর শম্পা আমরা ছিলুম দুই বোন—এখন আমরা চার বোন। মিলে মিশে পরমানন্দে সকলেই থাকবো।

•

পরের দিন সকালে রাজার কাছে গিয়ে চম্পা তাঁকে বলল তাঁর জীবনের কাহিনী—বলল—নিজেকে রক্ষা করবার জন্য পুরুষ বেশে আপনার কাছে পরিচয় গোপন রেখে চাকরি নিয়েছিলুম—সেই চাকরির দৌলতে ভাগ্য আমাদের ফিরেছে মহারাজ। মিথ্যা পরিচয়ে যে অপরাধ করেছি, ক্ষমা করবেন।

রাজা খুব সুখ্যাতি করে বললেন—মেয়েমানুষের এমন সাহস, এমন বুদ্ধি···এর তুলনা নেই! এখন তোমার যদি কোনো প্রার্থনা থাকে, বলো।

চম্পা বলল—সৈন্য নিয়ে সাহয্যে করে আমার শ্বশুরের রাজ্য উদ্ধার করে দিন।

দুই রাজায় হলো পরিচয়—বন্ধুত্ব। রাজা দিলেন প্রচুর সৈন্য—সে সব সৈন্য নিয়ে হৃত রাজ্য উদ্ধার করলেন। আবার বসলেন নিজের রাজ-সিংহাসনে।

তারপর শান্তি—সুখ—আনন্দ।

দু'জন চাষা...গাঁয়ে পাশাপাশি দুখানা ক্ষেত—দুজনে দু'ক্ষেতে চাষবাস করে। দুজনে বেশ ভাবসাব আছে।

সেবারে কি যে হলো, চৈত্রমাস থেকে বৃষ্টি নেই- রোদের তাপে মাঠঘাট সব ফেটে চৌচির—কারো ক্ষেতে একটা দুর্বো ঘাস পর্যন্ত নেই। কি করে দিন চলবে!

দুজনে গাঁ ছেড়ে বেরুলো...সহরে গিয়ে চাকরি করবে। কিন্তু সহর কি এখানে?

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে...দু'চার টাকা যা সম্বল ছিল, পথে মুড়ি আর চানা খেতে খেতে গেল ফুরিয়ে। কি খাবে, কোন সংস্থান নেই।

ধূ-ধূ মাঠ—মাথার উপরে দুপুরের তপ্ত সূর্য...পথ তেতে আগুন। হাঁটতে হাঁটতে অনেকক্ষণ পরে পেলো বড় একটা গাছ, সেই গাছতলায় দুজনে বসলো। বসে দুজনে কথা হচ্ছে, এখনো কতদূরে সহর, কে জানে! পথে দু-একখানা গাঁ মিলেছিল—কিন্তু গাঁয়ের লোক গরীব—নিজেরা খেতে পায় না, তারা চাকর রাখবে কি!

দুজনে কথা হচ্ছে এমন সময় সে পথে এলো মোটাসোটা একজন মহাজন। দুজনকে দেখে মহাজনের হলো দয়া—

দুজনের সামনে একটা সিকি ফেলে দিয়ে মহাজন চললো নিজের পথে এগিয়ে!

একজন দেখলো সিকি—চেঁচিয়ে উঠলো—একটা সিকি। সে যেমন নিতে যাবে, দু'নম্বর চাষা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সিকিটা নিলে কুড়িয়ে।

তখন দুজনে তর্ক—এ সিকিটা মহাজন কাকে দিয়েছে? এক নম্বরকে না, দু' নম্বরকে, সে কথা কাকেও সে বলেনি! তখন এক নম্বর চাষা বলে—আমি আগে সিকি দেখেছি—ও

সিকি আমার। দু'নম্বরও বললে—আমি সিকি কুড়িয়েছি যখন, তখন ও সিকি আমার।

দুজনের তর্ক থামে না—তর্ক ছেড়ে হাতাহাতির উপক্রম।

কিন্তু হাতাহাতি করবে, দুজনের কারো সে সামর্থ নেই! তখন স্থির হলো,—মহাজনকে এখনো দেখা যাচ্ছে। ঐ

চলেছে—গিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করা যাক—এ সিকি উনি কাকে দিয়েছেন।

—ও মশাই—ও মশাই! বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দুজনে ছুটলো মহাজনের পিছনে।

তাদের ডাকে মহাজন দাঁড়ালো, বললে,—কি? কি বলছো?

দু'জনে বললে,—আমরা দুজন। আপনি দিয়েছেন একটি সিকি—এ সিকি আপনি কাকে দিয়েছেন?

মহাজনের ভারী মজা লাগলো। মহাজন বললে—তোমাদের মধ্যে যে বেশী বোকা, তাকে দিয়েছি।

দুজনেই তখন চেঁচিয়ে উঠলো—তাহলে আমাকে....আমাকে! আমিই হলুম বেশী বোকা!

মহাজন বললে—তা হবে না। আমি শুনবো—তোমরা দুজনে বলো, কে কি বোকামির কাজ করেছো—শুনে আমি বিচার করবো কে বেশী বোকা।

এক নম্বর চাষা তখন বললে—শুনুন মশাই, তাহলে আমি বলি সে বোকামির গল্প।

এক নম্বর বলতে সুরু করলো—নিজের গাঁ থেকে ভিন গাঁয়ে কুটুম বাড়ীতে যাচ্ছিলুম—পায়ে ছিল চটি জুতো, গায়ে ছিল বেনিয়ান জামা। ভোরে বেরিয়েছিলুম ঘর থেকে—দুপুরের রোদে একটা মাঠ পার হচ্ছিলুম—রোদে খুব তাপ...হেঁটে হেঁটে পা টনটন করছিল....মাঠের মধ্যে এক-জায়গায় একটা বড় গাছ—গাছতলায় একটা কূয়ো। ভাবলুম, দুপুরের রোদে না হেঁটে ঐ কূয়োতলায় পড়ে জিরুই; তারপর বিকেলে আবার হাঁটা সুরু করবো! বেনিয়ান খুলে শুয়ে পড়লুম।

চটি জোড়া খুলে রাখলুম। তারপর বেশ ঘুমিয়ে পড়েছি—দিব্যি বাতাস ছিল···খুব গাঢ় ঘুম! শোবার সময় গায়ের বেনিয়ান খুলে কূয়োর পাড়ে রেখেছিলুম! বিকেলে ঘুম ভাঙতে দেখি, বেনিয়ানটা বাতাসে উড়ে কূয়োর মধ্যে পড়েছে—আর চটি জোড়া নেই। নিশ্চয় কোনো কুকুর এসে নিয়ে গেছে।

মুস্কিলে পড়লুম···আদুড় গায়ে, খালি পায়ে কুটুম-বাড়ী যাই কি করে? ভাবলুম—ঘরে ফিরি—ফিরে সকালে আবার বেরুবো।

তখন আবার গাঁয়ের পথে ফিরলুম। সন্ধ্যার সময় এলুম গাঁয়ের মুখে। গাঁয়ের মুখে হাট। হাটে দেখি, আমার ভাইপো এসেছে বেচা-কেনা করতে। আমাকে সে দেখলো। যেমন দেখা—কথা নয়, বার্ত্তা নয়, সে গাঁয়ের দিকে ছুটলো।

তারপর আমি বাড়ী আসতে দেখি, বাড়ীর সামনে পাড়া-পড়শীর ভিড়···আর আমার বাড়ীতে কান্নার রোল।

ভাবলুম, বাড়ীতে কেউ মারা গেছে। আমিও তখন বাড়ীতে ঢুকে সকলের সঙ্গে কান্না জুড়ে দিলুম।

অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর দম ফুরোলে জিজ্ঞাসা করলুম—"বাড়ীতে কে এর মধ্যে মারা গেল?"

বাড়ীর লোকেরা বললে—কে আবার মারা যাবে! কেউ না।

আমি বললুম—তবে সকলে এত কান্নাকাটি করছো কেন?

বাড়ীর লোক বললে—তুমিও তো কাঁদলে।

আমি বললুম—তোমরা কাঁদছো দেখে আমি ভাবলুম বাড়ীতে কেউ মারা গেছে, তাই তোমরা কাঁদছো! কেউ মরেনি যদি তাহলে তোমরা হঠাৎ কাঁদতে লাগলে কেন?

বাড়ীর লোকজন বললে – তোমার ভাইপো হাট থেকে ছুটতে তে ফিরে এসে বললে—তুমি কুটুম বাড়ী থেকে ফিরুছো—তোমার গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই—নিশ্চয়ই কুটুম বাড়ীতে কেউ মারা গেছে—তাই আদুড় গা, খালি পা।

আমি বললুম – কুটুম-বাড়ী গেলুম কখন! পথের মধ্যে জামাটা গেল কূয়োয় পড়ে—চটি জোড়া কুকুরে নিয়ে গেছে। আদুড় গায়ে খালি পায়ে কি করে কুটুম বাড়ী যাই! তাই আমি ফিরে আসছি পথ থেকে।

মহাজন বললে—কিন্তু না জেনে, না শুনে এমন কান্নাকাটি — হ্যাঁ তুমি বোকা বটে!

তার পর দু-নম্বরের দিকে চেয়ে মহাজন বললে—এখন শুনি তোমার বোকামির গল্প বল।

তখন দু-নম্বর চাষা সুরু করলো তার গল্প—

বিয়ে পরে শ্বশুর বাড়ীতে হলো আমার নেমন্তন্ন। শ্বশুর বাড়ীতে জামাইয়ের নেমন্তন্ন—বুঝলুম নানারকম ব্যঞ্জন তৈরী হবে—জামাইকে লুচি পোলাও খাওয়াবে। বাড়ীর লোকজন আমাকে হুঁশিয়ার করে বললো—নতুন-জামাই—শ্বশুর বাড়ীতে অনেক অনেক কিছু খেতে দেবে—খুব অল্প-সল্প খাবি। বেশী বেশী খেলে তারা হাসবে, বলবে, জন্মে কিছু খায়নি!

ভোরে উঠে শ্বশুরবাড়ী গেলুম। বাড়ী ঢুকতেই রান্নার গন্ধে মুখে লালা এলো। মনে হলো রান্নাঘরে ঢুকে সব খেয়ে ফেলি! কিন্তু বাড়ীর লোক হুঁশিয়ার করে দিয়েছে—অল্পসল্প খেতে হবে—বেশী বেশী খেলে এরা হাসবে।

স্নান করলুম। তারপর খাবার পালা। আসন পেতে তারা আমাকে বসালো—সামনে বড় থালায় পোলাও, লুচি,

কালিয়া···নানা রকম তরকারী দেখে আমার যা হতে লাগলো—খিদেও পেয়েছে খুব। খেতে বসলুম, শাশুড়ী বসলো সামনে খাওয়াতে—এটা খাও, ওটা খাও। আমি সব কিছু একটু একটু খুটে খেতে লাগলুম! শ্বশুর বাড়ীর লোকজন ভারী ব্যস্ত—এটা আর একটু খাও, ওটা খাও একটু!···আমি বললুম—উঁহু, আমি কম খাই।

সব কিছু একটু একটু খেলুম—পেটে খিদে রইলো, উঠে পড়লুম। তারপর সারাদিন পেটে খিদে! বিকেলে জলখাবার খেলুম না—বললুম,—বিকেলে কিছু খেলে সহ্য হয় না।

রাত্রে আবার ভুরি-ভোজনের আয়োজন। আমি শুধু দাঁতে কাটলুম—পেট যেমন খালি, তেমনি খালি রইলো।

তারপর রাত্রে শুতে গেলুম। কিন্তু পেটে খিদে—ঘুম হবে কেন? সারারাত্র পেটের জ্বালায় থাকা যায় না! বাড়ীর লোকজন ঘুমে অচেতন···বৌও ঘুমে অচেতন। আমি থাকতে পারলুম না। উঠে অন্ধকারে দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে রান্নাঘরে এলুম—এ হাঁড়ি খুলি, ও হাঁড়ি খুলি···কিছু পাই না! হঠাৎ দরজায় মাথা গেল ঠুকে—দড়াম করে শব্দ—তখন রান্নাঘরের কোণে ছিল কটা হাঁসের ডিম—তাড়াতাড়ি দুটো ডিম তুলে নিয়ে নিজের ঘরে এলুম। এসেই ডিম দুইটি কোথায় রাখি—মুখে পুরলুম। কাঁচা ডিম। বাড়ীর লোকজন উঠে পড়লো—চোর এসেছে ভেবে চারিদিকে ছুটোছুটি···তারপর এলো আমার ঘরে, তাদের হাতে আলো।

আমাকে দেখে শাশুড়ী বললে—ওমা, এ কি··জামাইয়ের দু' গাল ফুলে ঢ্যাপ—কি হলো গো?

সকলে কাছে এসে বলে—তাইতো।

আমাকে বললে—খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা? এ কি হলো?

আমি কথা কইতে পারি না। দুগালে দুটো কাঁচা ডিম। আমি শুধু তাদের পানে চেয়ে রইলুম!

সকলের মহা ভাবনা। শাশুড়ী বললে—বদ্যি ডাকো।

শ্বশুর বদ্যি নিয়ে এলো—বদ্যি অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখে আমার দু'গাল টিপতে লাগলো। টিপে বদ্যি বললে—ফোড়া। কাটতে হবে!

এ কথা বলে বদ্যি একখানা ধারালো ছুরি বার করে আমার ডান গালে ফ্যাঁশ করে দিলে সে ছুরি বসিয়ে। ছুরির খোঁচায় ডান গাল ফুঁড়ে ডিমের খোলা ভেঙ্গে ডিমের ভিতরকার সব কিছু বেরুলো। বদ্যি গালটা টিপলো—ভড়ভড় করে ডিমের ভিতরকার কুসুমটুকু বেরুলো। বদ্যি বললে—কি রকম পুঁজ বেরুলো—দেখছো!

যাতনায় আমি অস্থির—কিছু বলতে পারি না। সহ্য [illegible]লা।

বদ্যি তারপর বাঁ গালে ছুরি বসালো—সে গালেরও ঐ দশা !—

যাতনায় আমি আর থাকতে পারলুম না—মুখ থেকে থুথু করে ডিমের খোলাগুলো ফেলে চীৎকার করে উঠলুম,—মূর্খ বদ্যি···বলে কিনা, ফোড়া ! ডিম,····ডিম ছিল গালের মধ্যে।

বদ্যি চুপ !—শ্বশুর বাড়ীর সকলে তখন গালে হাত দিয়ে বললে—ওমা কি বোকা জামাই গো ! ছুরির জ্বালা সহ্য করলো, তবু মুখে 'রা' সরে না !

দু-নম্বরের গল্প শেষ হলো।

শুনে মহাজন বললে—এক নম্বর বোকা মানি···কিন্তু তুমি···ওর চেয়ে অনেক বেশী বোকা ! তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কাজেই সিকিটি হলো দু-নম্বরের।

গুরুমারা বিদ্যা

এক ব্রাহ্মণ · ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কাজ করে।

ব্রাহ্মণের দুটি পুত্র—দুটি ছেলে লেখাপড়া করে না··· হৈ-হল্লা করে বেড়ায়—একেবারে নিরেট মূর্খ !

ব্রাহ্মণের বয়স হয়েছে। ছেলেদের জন্য ভেবে তিনি আকুল। তিনি মারা গেলে ছেলেদের কি গতি হবে · কি করে তাদের পেট চলবে ··এ ভাবনায় ব্রাহ্মণের রাত্রে ঘুম হয় না।

ব্রাহ্মণ একদিন যজমানের বাড়ীতে যজন-যাজন সেরে ফেরবার পথে এক মুদির দোকানে বসেছেন—ছেলেদের কথা ভাবছেন—বিরস ম্লান শুকনো মুখ। এমন সময় এক সাধু এলো সেখানে। ব্রাহ্মণকে দেখে সাধু বললে—তোমাকে খুব চিন্তিত দেখছি—ব্যাপার কি ? কি সে চিন্তা ?

ব্রাহ্মণ তখন দুই ছেলের কথা বললেন। শুনে সাধু বললে, এর জন্য কিসের ভাবনা ঃ ছেলে দুটিকে আমার হাতে দাও— আমি নিয়ে যাব, আমি তাদের শিক্ষা দেবো। আমার শিক্ষায় তাদের কোনো দুঃখ থাকবে না। একবছর তারা আমার কাছে থাকবে। এই বছরেই তাদের শিক্ষা শেষ হবে।

শুনে ব্রাহ্মণ বললেন,—বেশ।

সাধু বললে,—কিন্তু বাপু একটি সর্ত আছে। মানে, এক

বছর পরে ছেলেদুটিকে তোমার কাছে আমি নিয়ে আসবো—তখন একটি ছেলে তুমি নেবে, আর একটি ছেলে আমাকে দান করবে।

ব্রাহ্মণ ভাবলে, তাতে কি? একটি তো আমার কাছে থাকবে!

ব্রাহ্মণ বললে,—এ সর্ত্তে রাজী।

সাধু বললে,—কাল সকালে আমি তোমার বাড়ী যাব, ছেলে দুটিকে নিয়ে আসবো।

পরের দিন সাধু এসে ছেলেদের নিয়ে গেল। তারপর তাদের শিক্ষা সুরু হলো। কাব্য, ব্যাকরণ শিখলো ছেলেরা, তারপর পূজার্চ্চনার মন্ত্র-তন্ত্র। সাধু দেখলো ছোট ছেলেটি ভারী বুদ্ধিমান, বড় একটু বোকাপানা। ছোটটির উপর সাধুর মন পড়লো। ছোটকে সাধু শেখালো যাদুবিদ্যা, বড়কে যাদুবিদ্যা

শেখালো না। বড়কে যে যে বিদ্যা শেখালো তার জোরে বড় তার খাবার সংস্থান করতে পারবে।

এক বৎসরে শিক্ষা শেষ হলো। ছেলেদের নিয়ে সাধু ব্রাহ্মণের বাড়ী রওয়ানা হল।

ছেলেদের নিয়ে সাধু এলো সন্ধ্যার সময় একটি চটিতে—এখানে রাত্রিবাস—তারপর কাল সকালে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে যাত্রা।

ছেলেরা শুনেছে বাপের সঙ্গে সাধুর সর্ত। ছোট না ঘুমিয়ে চালাকি করে বেড়াতে বেরুবার নাম করে নিঃশব্দে বাড়ী এসে বাবাকে বললে,—শোন বাবা, আমাদের একজনকে

সাধু যখন চাইবে, তুমি বড়কে দিয়ো—আমাকে কিছুতে ছেড়োনা। সাধু যত কাকুতি-মিনতি করুক, শাপমন্তি—ভুলো না। ওর সঙ্গে এমন সর্ত তো নেই যে, ওর যাকে খুশী, তাকে নেবে। বুঝলে, তোমাকে চুপিচুপি এসে হুশিয়ার করে গেলুম।

ব্রাহ্মণ বললে,— বেশ, তাই হবে।

পরের দিন সকালে দুই ছেলেকে নিয়ে সাধু এলো ব্রাহ্মণের বাড়ী। সাধু বললে—দুটি ছেলেকে আমি পণ্ডিত করে দিয়েছি এক বছরে। এখন যা সর্ত্ত আছে—একটি তুমি নেবে, আর একটি আমি নেবো।

ব্রাহ্মণ বললে,—বেশ, আপনি বড়কে নিন, ছোটকে আমি নেবো।

সাধুর চক্ষুস্থির। সাধু বললে…না, তা হবে না। ছোটকে আমি নেবো—তুমি নাও বড়কে। ছোটর উপর আমার বড় মায়া পড়েছে।

ব্রাহ্মণ বললে—ছোটর উপরে আমারো বেশী স্নেহ—এ ছোট কি না!

দুজনে তখন তর্ক। এ তর্কের মীমাংসার জন্য পাড়াপড়শীর ডাক পড়লো। সব কথা শুনে পড়শীরা বললে,—এমন সর্ত ছিল না যে সাধু নিজের খুশীমতো ছেলে নেবে। তার সঙ্গে সর্ত, ব্রাহ্মণ তার হাতে একটি ছেলেকে দান করবে। ছেলে ব্রাহ্মণের—দান করবে ব্রাহ্মণ নিজের খুশীমতো।

সালিশীতে এ কথা সাব্যস্ত হলে সাধু রেগে আগুন। সাধু বললে,— ছোটকে যদি না পাই, তাহলে আমি কাকেও চাই না, তোমার ছেলে তোমার থাকুক।

এ কথা বলে রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে সাধু চলে গেল। দু-চার দিন পরে ব্রাহ্মণ বললে দুই ছেলেকে—সংসারের দশা তো দেখছো! চালে খড় নেই, ঘরে চাল নেই, ডাল নেই। কি করে চলবে?

ছোট বললে·· কিছু ভেবো না বাবা। আমি যে যাদুবিদ্যা

শিখেছি, সেই বিদ্যার জোরে আমি এখনি সব ব্যবস্থা করছি।

ব্রাহ্মণ বললেন—কি ব্যবস্থা, শুনি?

ছোট বললে—শোনো, যা বলি—পথের মোড়ে একটি খালি বাড়ী আছে—আজ রাত্রে আমি ঐ খালি বাড়ীতে যাবো। তুমি দেখবে আমি বাড়ীতে ঢুকেছি—দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে; কিন্তু আমার সঙ্গে যাবে না। তার পর কাল সকালে ও বাড়ীতে তুমি যাবে। গিয়ে আমাকে দেখতে পাবে না—আমার বদলে দেখবে বেশ হৃষ্টপুষ্ট একটি গাই গোরু। সেই গোরু নিয়ে তুমি হাটে যাবে, হাটে তুমি বেচবে একশো টাকা দামে। তার চেয়ে এক পয়সা কম বা বেশী দাম নেবে না। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার, গোরু দেবে কিন্তু গোরুর গলার দড়িটি দেবে না—সেটি নিজে রাখবে—দড়িটি হাতছাড়া করবে না।

এই কথামত ছোট গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় সেই খালি বাড়ীতে ঢুকলো। পথে দাঁড়িয়ে বাপ দেখলেন ঢুকতে। পরের দিন সকালে ব্রাহ্মণ খালি বাড়ীতে ঢুকে দেখেন দিব্যি হৃৎপুষ্ট সাদা একটি গাই গোরু। গোরুর গলায় দড়ি।

বাপ তখন দড়ি ধরে গোরু নিয়ে হাটে গেলেন—গিয়ে একশো টাকায় সে গোরু বেচে চাদরের খুঁটে টাকা বেঁধে দড়িটা হাতে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

বাড়ী আসতেই দড়িটা গেল পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছেলে ঢুকলো বাড়ীতে। ছোট বললে আমিই যাদুবিদ্যার জোরে গোরু হয়েছিলুম—দড়ি নিয়ে তুমি বাড়ী ঢুকতেই, আবার যে ছেলে সেই ছেলে হলুম! এখন ঐ একশো টাকায় ঘর ছাও—চাল-ডাল আনো।

কিন্তু একশোটি টাকা এক মাসে গেল ফুরিয়ে। ছোট তখন বললে বাবাকে—আজ সন্ধ্যার সময় আমি আবার ঐ খালি বাড়ীতে ঢুকবো। কাল সকালে তুমি ও বাড়ীতে গিয়ে আমাকে দেখতে পাবে না - দেখবে, লাগাম-লাগানো বেশ একটা তেজী ঘোড়া। লাগাম ধরে সে ঘোড়াকে নিয়ে তুমি হাটে গিয়ে বেচবে—দুশো টাকা দাম নেবে—তার এক পয়সা কম নয়। খরিদ্দারকে ঘোড়া দেবে কিন্তু সাবধান—লাগামটা দিয়ো না। লাগাম নিয়ে তুমি বাড়ী ফিরবে।

বাপ বললেন—তাই হবে।

পরের দিন ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়া নিয়ে ব্রাহ্মণ এলেন ঘোড়ার হাটে।

ঘোড়া দেখে খদ্দেরের ভিড়—এখন ঘোড়ার হাটে সেদিন সেই সাধু এসেছে—ব্রাহ্মণের সঙ্গে ঘোড়া দেখে বুঝলো, ছোট ছেলে যাদুবিদ্যার জোরে ঘোড়া হয়েছে। সাধু তখন তার লোটা-কম্বল ফেলে পোষাক বদলে, চেহারা বদলে একটি ডাণ্ডা হাতে এলো ঘোড়ার খদ্দের সেজে।

ঘোড়ার দাম-দস্তুর চলছে—ব্রাহ্মণ বললেন,—দুশো টাকা—তার এক পয়সা কম নয়।

দর-দস্তুর চলছে, খদ্দেরের বেশ ভিড়। সাধু তখন করলে কি—ঘোড়ার গায়ে মারলো তার হাতের ডাণ্ডার একটি ঘা খুব জোরে। ঘোড়া তিড়বিড়িয়ে লাফিয়ে উঠলো। ব্রাহ্মণের হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম গেলো খসে—লাগাম-খোলা ঘোড়া তখন দিক-বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে তীর বেগে ছুটলো যেদিকে দু'চোখ যায়। সাধুও ছুটলো তার পিছনে তীর বেগে।

যেতে যেতে সাধু গর্জাচ্ছে—কত দূরে যাবে বাবা! দু-ক্রোশ,

চার ক্রোশ বড় জোর—তারপর তোমাকে ধরবো। হাজার হোক তুমি হলো সাকরেদ—আমি তোমার ওস্তাদ গুরু।

এ কথা ঘোড়ার কানে গেল। ক্রমাগত ছুটে সে তখন বেশ হাঁফিয়ে পড়েছে, সাধু কাছে এসে পড়েছে। তারপর ঘোড়ার মূর্তি ছেড়ে ছেলে হলো পায়রা। পায়রা হয়ে আকাশে উড়ে চললো।

সাধু সঙ্গে সঙ্গে ধরলো বাজ পাখীর রূপ। বাজ পাখীর রূপ ধরে সাধু চললো পায়রার পিছনে।

সাধু বললে,—পায়রা হয়ে আমার চোখে ধূলো দেবে বাপধন, তা কি হয়! এবারে তোমাকে ধরবোই।

উড়তে উড়তে পায়রা এলো বড় একটি নদীর ওপর, বাজপাখী তখন খুব কাছে এসে পড়েছে, ধরে আর কি! ঝুপ করে পায়রা পড়লো নদীর জলে, পড়েই মাছ হয়ে জলে দিল ডুব।

সঙ্গে সঙ্গে সাধু হলো কুমীর,—কুমীর হয়ে জলে ডুব দিল মাছের সন্ধানে।

সাধু কুমীর হয়ে নদীতে যে মাছ পায়, হাঁ করে মুখে পোরে।

ছোট ছেলে মাছ হয়ে সাঁতরে সাঁতরে কোনো মতে তীরে এসে উঠলো। উঠেই মশা হয়ে উড়ে চললো।

নদীর কূলে শ্মশান আর মশান। মশানে একটা গাছের ডালে গলায় ফাঁস-বাঁধা এক মড়া ঝুলছে। বোধ হয়, রাজার হুকুমে তার ফাঁসি হয়েছে। মড়াকে দেখে মশা উড়তে উড়তে গিয়ে ঢুকলো মড়ার একটি নাকের মধ্যে।

সাধু আবার মানুষ হয়ে এলো মশানে, গাছের উপর থেকে মড়া নামাতে ভরসা হলো না। সে করলে কি, একতাল মাটী

মড়ার দু' নাকের ফুটো দিলে বুজিয়ে, সে মাটীর তাল সরিয়ে মশার সাধ্য নেই যে বেরুবে!

সাধু বললে, থা'ক্ মশা হয়ে ঐ মড়ার নাকের মধ্যে—হাঁফিয়ে মরবি।

তবু ভয় যায় না। ও মাটি যদি ঝরে যায়! একটা চাদর পেলে ভালো হতো—মড়ার মাথাটায় এটে বেঁধে দিত। কিন্তু কোথায় পাবে এ মশানে-শ্মশানে চাদর?

হঠাৎ দেখে এদিকে একজন মানুষ আসছে। মানুষটি কাছে এলে সাধু বললে—ও বাবা, তোমার অনেক পুণ্যি হবে, সাধুকে তোমার ঐ চাদরখান দান করো।

সাধু সন্ন্যাসীর উপর তখন সকলের খুব ভক্তি ছিল। সন্ন্যাসীমানুষ চাইছে,—সে দিলে সাধুকে তার গায়ের চাদর—দিয়ে সে মানুষ চলে গেল।

সাধু তখন সেই চাদর ছিঁড়ে তিন ফালি করলো, তারপর গাছে উঠে মড়ার নাক ঘিরে তিন ফেরতা ফ্যাটা বেঁধে দিলে।

গাছ থেকে নেমে সাধু এলো সহরে এক সদাগরের বাড়ী। খুব ভক্তি সাধু-সন্ন্যাসীর উপর। সদাগর দাতা মানুষ,—কেউ এসে কিছু প্রার্থনা জানালে, সে প্রার্থনা পূরণ করে।

সাধু এসে সদাগরকে বললে- আমার একটি প্রার্থনা আছে।

সদাগর বললে,—কি প্রার্থনা, বলুন?

সাধু বললে, আপনি কারো প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না, জানি, তাই বড় আশা করে আপনার কাছে এসেছি। আমার প্রার্থনা আমি সাধন-ভজন করবো—মা কালীর সাধনা—সে সাধন-ভজনে একটা মড়া চাই,—এখানে মশানে দেখলুম গাছের ডালে মড়া ঝুলছে। সেই মড়াটাকে এনে দিতে হবে। তুমি পুণ্যাত্মা

মানুষ—তাই তোমাকে এ কাজ করতে বলছি। ঐ মড়া না পেলে আমার সাধনা পণ্ড হবে।

সদাগর বললো—তাইতো! এ যে আপনি আমাকে বিপদে ফেললেন—এ কাজ কখনো করিনি। বড় কঠিন কাজ—সাধন-ভজনের ব্যাপার। কিন্তু আমি কারো প্রার্থনা এ পর্যন্ত অপূর্ণ রাখিনি—আপনি সাধু মানুষ, বেশ এনে দেবো। তবে দিনের বেলায় লোকে দেখলে কি বলবে। আর কেউ বললে, আমি রাজী হতুম না—শুধু আপনি সাধু বলেই···

সাধু বললে - তোমার জয় হোক!

পরের দিন রাত্রি··· মাঝরাত্রি···নিঝুম নিশুতি মাঝরাত্রি····বড় একখানা ছুরি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সদাগর বেরুলো যাত্রাপথে···

সহর পার হয়ে সদাগর এলো শ্মশানে, সেই গাছের নীচে—এসে দেখে, গাছের ডালে গলায় দড়ির ফাঁস বাঁধা মড়া ঝুলছে। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নেই।

ঘোড়া বেঁধে রেখে সদাগর উঠলো সেই গাছের উপর। তারপর ছুরিখানা দিয়ে মড়ার দড়ি কাটলো—মড়াটা ঝুপ করে মাটিতে পড়লো। সদাগর নামলো গাছ থেকে। নেমে দেখে মড়া মাটিতে নেই—গাছের ডালে দড়ি বাঁধা যেমন ঝুলছিল, তেমনি ঝুলছে।

সদাগর ভাবলো তাইতো, ভুল হলো? আবার সে গাছে উঠলো—ছুরি দিয়ে আবার মড়ার দড়ি কাটল, মড়াটি মাটিতে পড়লো, ঝুপ করে শব্দ হল—সে শব্দ সদাগর স্পষ্ট শুনলেন। কিন্তু গাছ থেকে নেমে দেখে মাটিতে মড়া নেই, গাছের ডালে ঝুলছে!

ভাবলো এবারো ভুল হলো। সদাগর আবার উঠলো

গাছে—আবার মড়ার দড়ি কাটলো—মড়া আবার পড়লো মাটিতে। এবারো গাছ থেকে নেমে সদাগর দেখে মাটিতে কোথায় মড়া! গাছের ডালে তেমনি ঝুলছে।

বার-বার তিনবার! সদাগরের গা ভয়ে ছম্‌ছম্‌ করতে লাগলো। মনে হলো নিশ্চয়ই কোনো ভুতুড়ে ব্যাপার। সেজন্য তার ভয় নেই। আবার দেখবে, কিন্তু রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে, এখনি ভোর হবে। কাজেই সে আর চেষ্টা করলো না। ঘোড়ায় চড়ে বাড়ী ফিরলো।

সবে তখন ভোরের আলো ফুটেছে। বাড়ী এসে সদাগর দেখে তার বাড়ীর ফটকে সাধু বসে আছে।

সাধু বললে - কি…পারলে না?

সদাগর বললে—না। সে তখন খুলে বললো ব্যাপার।

শুনে সাধু বললে, আমার বলতে ভুল হয়েছিল। তা থাক্‌, আজ রাত্রে আবার যেতে হবে—তবে সাবধানে দড়ি কাটবে. মড়া যেন মাটিতে না পড়ে—তোমার ঘোড়া রেখো গাছতলায়—এমনভাবে মড়ার দড়ি কাটবে যেন মড়াটা মাটিতে না পড়ে তোমার ঘোড়ার পিঠে পড়ে। মড়া নিয়ে এলে তারপরে আমি সাধন-ভজন করবো। আর সে সাধন-ভজনের জোরে,…তুমি আছো সদাগর, তোমাকে আমি একটা রাজ্যের রাজা করে দেবো।

সদাগর বললে, বেশ, আজ আবার যাবো—আর আপনার কথামতো কাজ করবো।

সেদিন মাঝরাত্রে সদাগর আবার এলো শশানে। এসে গাছতলায় ঘোড়া রেখে গাছে উঠলো। গাছে উঠে ছুরি দিয়ে মড়ার দড়ি কাটলো, এমন কৌশলে দড়ি কাটলো যে মড়া এবারে মাটীতে পড়লো না; পড়লো তার ঘোড়ার পিঠে।

খুশীমনে গাছ থেকে নেমে সদাগর দেখে, ঘোড়ার পিঠে মড়া। নিজের মাথার পাগড়ী খুলে ঘোড়ার পিঠে মড়াটাকে বেশ মজবুত করে সে বাঁধলো—বেঁধে ঘোড়ার পিঠে বসে মড়াকে উদ্দেশ করে বললে—বার বার তিনবার পালিয়ে ছিলে, এবারে তোমাকে কায়দায় পেয়েছি। আর পালাতে পারবে না। সদাগরের কথা যেমন শেষ হওয়া,—পাগড়ীর বাঁধন খুলে মড়া আবার উঠলো গাছের ডালে—উঠে আগেকার মতো দড়ি বাঁধা ঝুলতে লাগলো।

সদাগর অবাক! এ কাজ করতে সদাগর গলদঘর্ম। ভাবলো ভীষণ ভূতুড়ে ব্যাপার! সদাগর বাড়ী ফিরলো।

সাধু বললেন—যা বলেছিলুম, করেছিলে?

সদাগর বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে?

সদাগর বললে বৃত্তান্ত। শুনে সাধু বললে—সর্বনাশ! কথা কয়েছিলে—অন্যায় করেছো। কথা কইবে না, তুমি কথা কয়েছিলে বলে সব মাটী হয়ে গেল। কাল রাত্রে অমনিভাবে ঘোড়ার পিঠে মড়া বাঁধবে—তারপর নিঃশব্দে সেটাকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসবে, একটি কথা কইবে না। তাহলেই কাজ উদ্ধার হবে।

পরের দিন রাত্রে আবার ঘোড়ায় চড়ে মশানে যাত্রা। মড়ার দড়ি কেটে ঘোড়ার পিঠে মড়া চাপিয়ে তারপর তাকে বেশ মজবুত করে বেঁধে সদাগর বাড়ীর দিকে রওনা হলো।

ক'পা এগিয়েছে, অমনি মড়া বললে—শুনছো সদাগর মশাই!

সদাগর এ কথা স্পষ্ট শুনলো—কোন কথা বললে না।

মড়া বললে—ঘোড়া একবার থামাও, আমি একটা কথা বলবো, শুধু শোনো। তোমাকে কোনো কথা বলতে হবে না।

সদাগর সজ্জন মানুষ—কারো প্রার্থনায় কখনো 'না' বলে না। সদাগর ঘোড়া থামালো। তখন মড়া বললে—একটি কাহিনী বলবো। তোমার এই সহরেই ঘটেছিল এক আশ্চর্য ঘটনা। সে কাহিনী আমি বলবো।

সদাগর এবারে কোনো কথা বললো না, তবে কাহিনী শোনবার জন্য মনে হলো কৌতূহল।

মড়া বলতে লাগলো কাহিনী—এক গাঁয়ে ছিলেন এক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের ঘরে ছিল ব্রাহ্মণী, আর তাদের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়ে ডাগর হয়েছে—তার বিবাহ দিতে হবে।

ঘুরে ঘুরে ব্রাহ্মণ মেয়ের জন্য পাত্র ঠিক করে এলো। পাত্র দিলে ব্রাহ্মণের হাতে একশো টাকা নগদ—যেমন দস্তুর। বিবাহের দিন স্থির করে ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরলো। এ কথা বাড়ীতে কাউকেও ব্রাহ্মণ বললেন না।

ওদিকে ব্রাহ্মণী একটি পাত্র ঠিক করলেন। পাত্রের কাছ থেকে একশো টাকা বায়না নিয়ে বিবাহের দিন স্থির করে ব্রাহ্মণী বাড়ী ফিরলেন। পাত্রের কথা ব্রাহ্মণীও বাড়ীতে কাউকেও বললেন না।

ব্রাহ্মণের ছেলেও ঘুরে ঘুরে একটি পাত্র স্থির করে তার কাছ থেকে একশো টাকা নগদ নিয়ে বাড়ী ফিরলো। এ কথা ছেলেও বাড়ীতে কাউকেও বললো না।

তারপর বিয়ের জন্য যে দিন স্থির হয়েছে, ব্রাহ্মণ সেদিন বাজারে গেলেন—গিয়ে জিনিষপত্র কিনে নিয়ে এলেন। বাড়ীতে

ফিরে দেখে ব্রাহ্মণীও অনেক জিনিষপত্র কিনে নিয়ে এসেছেন। ব্রাহ্মণ বললে, এ সব জিনিষ নিয়ে এলে, তার মানে ?

ব্রাহ্মণী বললে—আজ মেয়ের বিবাহ। আমি পাত্র ঠিক করে দিন স্থির করেছি, কাকেও বলিনি। আজ রাত্রে বিবাহ।

ব্রাহ্মণ বললেন—সর্বনাশ। আমিও যে বিবাহের পাত্র ঠিক করে একশো টাকা নিয়ে বিবাহের দিন স্থির করেছি—আজ রাত্রে বিবাহ ! এখন উপায় ?

তাঁরা উপায় নিয়ে ভাবছে- ছেলে এলো বাজার থেকে জিনিষ-পত্র কিনে। বাবা বললে—এ সব জিনিষপত্র ?

ছেলে বললেন- বোনের জন্য পাত্র ঠিক করে তার কাছ থেকে একশো টাকা আগাম নিয়ে বিবাহের দিন স্থির করেছি—আজ রাত্রে বিবাহ।

সর্বনাশ ! তিন-তিন পাত্র আসবে বিবাহ করতে বরযাত্রী নিয়ে - মেয়ে তো একটি। কোন্ পাত্রের হাতে মেয়েকে দেবেন !

ভেবে উপায় পেলে না। তিনজনে ভাবছেন—ভাবছেন—ওদিকে সন্ধ্যা হলো—বাড়ীর দোরে তিন তিন পাত্র এসে হাজির বরযাত্রী নিয়ে।

মেয়ে এখনো পর্যন্ত জানে না, আজ রাত্রে তার বিবাহ। সে তার সমবয়সী একজন মেয়ের সঙ্গে বাড়ীর উঠানে খেলা করছিল—

বাড়ীর দোরে গোলমাল শুনে সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে সে উঠলো বাড়ীর ছাদে। দাসী এসে খবর দিলে—ও মা তোমার বিয়ে, তিন তিনটি পাত্র এসে হাজির—একটি পাত্র তোমার বাবা ঠিক করেছেন- একটি তোমার মা—আর একটি তোমার

দাদা। এখন কোন পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হবে তাই গণ্ডগোল বেঁধেছে।

মেয়ে ভাবলো—কি সর্বনাশ। বাপের পাত্রকে বিবাহ করলে মঙ্গল কিন্তু দাদার অপমান,—মায়ের পাত্রকে বিবাহ করলে বাবার আর দাদার অপমান—আবার দাদার পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হলে বাবার আর মায়ের অপমান।

মেয়ের মনে হলো, এর মীমাংসা অসম্ভব। তাই সে ছাদের আলসেয় উঠে ঝাঁপ খেয়ে পড়লো নীচে—সদরে লোকজনের ভীড়ের মধ্যে।

সকলে হৈ-হৈ শব্দে ছুটে এলো--কিন্তু···সকলে দেখে মেয়ের দেহে প্রাণ নেই—তার মৃত্যু হয়েছে।

মেয়ে বেশ সুন্দর—তিন পাত্রই দেখলো মেয়েকে। তারাও সকলের সঙ্গে হায় হায় করতে লাগলো। শুধু বাড়ীতে নয়—পাড়ায় উঠলো হাহাকার।

তারপর কন্যার দেহ নিয়ে সকলে এলো শ্মশানে—শ্মশানে চিতার আগুনে মেয়ের দেহ হলো ভস্মীভূত। সকলে শ্মশান থেকে চলে গেল--তিন পাত্র গেল না।

সদাগর একাগ্র মনে শুনলো এ কাহিনী···তারপর বলে উঠলো—হলো তোমার গল্প শেষ।

যেমন এ কথা বলা, মড়া খসে পড়লো ঘোড়ার পিঠ থেকে—পড়েই অদৃশ্য আবার সেই গাছের ডালে গিয়ে ঝোলা।

সদাগর হতভম্ব! ভাবলো—তাইতো, সাধুর নিষেধ না মেনে কথা কয়ে ফেলেছি? আমার দোষ!

সদাগর এসে সাধুর পায়ে পড়ে বললে—আমাকে ক্ষমা করুন সাধু—এবারেও অন্যায় করে ফেলেছি। কাল নিশ্চয়

নিয়ে আসতে পারবো। তার জন্য আমার জান যদি যায় -জান দেবো।

পরের দিন মাঝরাতে আবার শ্মশানে যাত্রা। ঘোড়ার পিঠে মড়া তুলে শ্মশান থেকে বেরিয়ে চলে এসেছে।

মড়া বললে -একবার ঘোড়া থামাও -আমার গল্পের শেষ এই শোন।

ও গল্পের শেষ! সদাগরের লোভ হলো শুনতে। সদাগর ঘোড়া থামালো।

মড়া বলতে লাগলো—শ্মশান থেকে সকলে চলে গেলে প্রথম পাত্র বললে—আমিও আবার চিতা জ্বেলে প্রাণ দেবো। কন্যার ছাইয়ের সঙ্গে আমারো ছাই মিশে থাকবে।

সে তাই করলো।

দ্বিতীয় পাত্র মায়ের পাত্র করলে কি --সেই ছাই নিয়ে শ্মশানের একদিকে গর্ত্ত খুঁড়ে পুঁতলো -সে বললে—এখানে চালা বেঁধে আমি থাকবো -ঐ ছাইগুলির পাশে। ভিক্ষা করে দিনাতিপাত করবো।

দাদার পাত্র—তৃতীয় পাত্র বললে—তুমি কিছু ছাই আমায় দাও...আমি সন্ন্যাসী হয়ে দেশে দেশে ঘুরবো—বাড়ীতে আর ফিরবো না।

তৃতীয় পাত্র সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পরের দিন সন্ধ্যার সময় এক গ্রামে এলো -গ্রামে ঢুকেই একখানা বাড়ী। বাড়ীর দোরে বসে একটি স্ত্রীলোক চরকা নিয়ে সূতো কাটছে।

সন্ন্যাসী বললে -মা গো আমার কাছে কিছু চাল আছে— ভিক্ষা করে পেয়েছি -সেই চালগুলি ফুটিয়ে আমাকে দুটি ভাত দেবে?

স্ত্রীলোকটি বললে—কেন দেবো না, বাবা? তুমি এসো, আমি ভাত ফুটিয়ে দিচ্ছি।

এ কথা বলে সে উঠলো চর্কা রেখে সন্ন্যাসীকে বললে দাওয়ায় বসতে। সন্ন্যাসী বসলো।

দাওয়ার এক কোণে একটা উনুন দাওয়ার একধারে ছ' সাত বছরের একটি মেয়ে ঘুমোচ্ছিল—স্ত্রীলোকটি করলে কি—সেই মেয়েটির দু' পায়ে আগুন লাগালো—তারপর মেয়ের জ্বলন্ত পা দুখানা নিয়ে দিলে উনুনে গুঁজে, তারপর উনুনে চাপালো হাঁড়ি···হাঁড়িতে জল ঢেলে হাঁড়ির মধ্যে চাপালো সাধুর দেওয়া চাল।

পা দুখানা পুড়ে ছাই হলো।

সন্ন্যাসীর দু' চোখ কপালে উঠলো! সে বললে—সর্বনাশ রাক্ষসী—আমি ও ভাত খাবো না।

স্ত্রীলোকটি বললে—তুমি ভেবো না, বাবা! বসো, ভাত এখনি পাবে।

সন্ন্যাসী বললে—না! ও ভাত আমি খাবো না। ও ভাত খাওয়া মানে ঐ মেয়েটিকে খাওয়া।

স্ত্রীলোকটি তবু তর্ক করে—সন্ন্যাসীও তাকে দেয় ধমক—এমন সময় স্ত্রীলোকটির স্বামী আর তার দুই ছেলে এলো বাড়ী।

স্বামী বললে—যখনি বাড়ী ফিরি তখনি শুনি তোমার চীৎকার, চ্যাঁচামেচি, আজ আবার সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে তর্ক।

স্ত্রীলোকটি তখন ভাত নামিয়ে পাতায় বেড়ে দিয়েছে—বলে, খাও ঠাকুর।

স্বামীও বললে—খাও ঠাকুর।

সন্ন্যাসী বললে – না, না, তুমি জানো না। ছোট মেয়েটার দু'খানা পা পুড়িয়ে ছাই করে এ ভাত রান্না হয়েছে।

স্বামী বললে—না, না, ঠাকুর, তা কি কখনো হতে পারে?

সন্ন্যাসী বললে—হলো আমার চোখের সামনে আর তুমি বলছো– তা কি হতে পারে?

স্ত্রীলোকটি বললে মেয়ে তো ঐ শুয়ে ঘুমাচ্ছে—নিজে তুমি দ্যাখো ঠাকুর—ওর পা ঠিক আছে কি না!

স্ত্রীলোকটি তার মেয়েকে জাগালো—সন্ন্যাসী মেয়ের দু' পা দেখলে। সন্ন্যাসী অবাক। চোখের সামনে যা দেখলে–তা' তবে!

হেসে স্ত্রীলোকটি বললে—ছাই থেকে শুধু পা কেন গোটা মানুষ যদি পুড়ে ছাই হয় তাহলে তাকেও আমি সশরীরে বাঁচাতে পারি—সে বিদ্যা আমার জানা আছে।

সন্ন্যাসী স্থম্ভির হলো—ভাবলো এ বিদ্যা যদি আমি শিখতে পারি! সন্ন্যাসী খাওয়া-দাওয়া করলো—তারপর রাত্রে সেইখানেই শুয়ে নিদ্রা।

সকাল হলো। সন্ন্যাসী বললে—আমি ভিক্ষায় যাচ্ছি-- সন্ধ্যার সময় আবার এখানে আসবো-আমাকে আজ এখানে আশ্রয় দেবে।

স্ত্রীলোকটি বললে – আচ্ছা দেব।

সন্ন্যাসী সে বাড়ীতে রইলো সাত দিন—তার উপর স্ত্রীলোকটির মায়া হলো তার কথাবার্তা শুনে, আচার ব্যবহার দেখে বুঝলো—কোনো বড় ঘরের ছেলে মনের দুঃখে বিরাগী হয়েছে।

আট দিনের দিন সন্ন্যাসীকে বললে—কি দুঃখে এই বয়সে তুমি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছো বাবা।

সন্ন্যাসী বললে দুঃখের কাহিনী—তোমার যাদুবিদ্যা যদি আমাকে শেখাও তাহলে সেই মেয়েটিকে আমি বাঁচাতে পারি। তার ছাই আমার সঙ্গে আছে।

স্ত্রীলোকটি শেখালো সন্ন্যাসীকে সেই বিদ্যা। সেই যাদু বিদ্যা শিখে সন্ন্যাসী ফিরলো।

চার দিনের পথ—সন্ন্যাসী এলো শ্মশানে। তার পর শ্মশানের সেই জায়গা খুঁড়ে মেয়েটির আর প্রথম পাত্রের ছাই তুলে ছাইয়ের উপর জল ছিটিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ছাইয়ের ভিতর থেকে মেয়েটি আর প্রথম পাত্র দু'জনে সশরীরে বেঁচে উঠলো।

মড়া বললে—এখন সমস্যা হলো তিনটি পাত্র—তারা তিন জনেই চায় মেয়েটিকে বিবাহ করতে। বলতে পার—কোন্ পাত্র বিবাহ করবার পাত্র।

সদাগর ভুলে গেল সাধুর নিষেধ! সদাগর বললে—দ্বিতীয় পাত্র। প্রথম পাত্র চিতায় পুড়ে মেয়েটির ছাইয়ের সঙ্গে মিশে আছে। তারা একই ছাইয়ে মিশে ভাই-বোনের সামিল হয়েছে। কাজেই প্রথম পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হতে পারে না। তৃতীয় পাত্র মেয়েটিকে পুনর্জন্ম দিয়েছে। সে হলো বাপের মতো। দ্বিতীয় পাত্র ছাই চৌকি দিয়েছে—তাই দ্বিতীয় পাত্রটি ওই মেয়েকে বিবাহ করতে পারে।

মড়া বললে—ঠিক বলেছো।

এ কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে খসে মড়া আবার সেই গাছের ডালে ঝুলতে লাগলো।

সদাগর স্তম্ভিত।

ফিরে এসে সাধুর পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে সদাগর বললে—

আমাকে খুব ঠকিয়ে পালিয়েছে কিন্তু আর নয়—আজ রাত্রে আবার আমি যাব।

সাধু বললে—মনে রেখো—মড়া যতক্ষণ আমার কাছে পৌঁছে না দিচ্ছ একটি কথাও বলবে না।

— তাই হবে ঠাকুর।

সে রাত্রে আবার ঘোড়ায় চড়ে শ্মশানে যাত্রা। মড়াকে এবার ঘোড়ার গলায় বেঁধে সদাগর ফিরছে শ্মশান থেকে···খানিক দূর এসে মড়া বললে—আজ একটি কথা বলবো, দয়া করে শোনো—তুমি কোনো কথা বলো না। আমার একটি প্রার্থনা আছে, আমার প্রার্থনাই শুধু পূরণ করো।

মড়া বললে—বড্ড গরম বোধ হচ্ছে, শুধু দয়া করে আমার মাথার ফ্যাঁটাটা যদি এবারও খুলে দাও- আর নাকের গর্ত মাটি দিয়ে বোজানো সেই মাটি ফেলে যদি দাও। আমি একটু নিশ্বাস নিই—তারপর আবার মুখে-মাথায় বেশ মজবুত করে ফ্যাঁটা বেঁধো। হাঁপ ধরছে। একটু খানি সময়ের জন্য শুধু—

সদাগরের মনে দয়া-মায়া আছে। সদাগর ভাবলো, বেচারীর হাঁফ ধরছে- একটু নিশ্বাস নিতে চায়···দিই খুলে ফ্যাঁটাটা।

সদাগর দিলে তার মাথার-মুখের ফ্যাঁটা খুলে— নাকের ফোকর থেকে মাটি দিলে ফেলে—সঙ্গে সঙ্গে পোঁ শব্দে মশা বেরুলো মড়ার নাক থেকে—বেরিয়ে একটু দূরে গিয়ে মশার রূপ ত্যাগ করে ব্রাহ্মণের ছোট ছেলের রূপ ধরলো—তারপর ছুটলো পথের উলটো দিকে।

হঠাৎ একটা ছেলেকে ছুটতে দেখে সদাগর বললে—ও ছেলে, ও ছেলে শোনো।

ছেলের বয়ে গেছে সে কথা শুনতে—সে ছুটলো সো নিজের বাড়ীতে।

সদাগরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মড়াটা পড়লো মাটীতে—পড়ে একটু নড়লো না! একেবারে নড়ন-চড়ন নেই। সদাগর তখন তার নাকে মাটী গুঁজে মাথা তুলে ফ্যাটা বাঁধলো—তারপর মড়াটাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে বাড়ী এলো।

শিকার এনেছে— সাধু মহাখুশী—নিজে নামালো মড়া ঘোড়ার পিঠ থেকে; নামিয়ে তার মাথার ফ্যাটা খুললো—তারপরে নাকের মাটি— মশা ধরবে বলে ওৎ পেতে বসলো।

কিন্তু কোথায় মশা!

সাধু বললে—সর্বনাশ করেছো সদাগর—আমার কুশাসন পালিয়েছে।

এ কথা বলে সেখানে আর এতটুকু দাঁড়ালো না। সাধু চললো ব্রাহ্মণের বাড়ী যে সহরে, সেই সহরে। ছেলেটা নিশ্চয় পালিয়ে নিজের বাড়ীতে গিয়েছে।

সহরে এসে একটা ঘরে সাধু নিলে আশ্রয়- সন্ধ্যার পর একবার বেরিয়ে পথে ঘুরবে যদি ছোটর দেখা পায়।

একদিন রাত্রে সে এলো ব্রাহ্মণের বাড়ীর সামনে। দরজা বন্ধ- ভিতরে আলো জ্বলছে—দরজার ফাটলে চোখ রেখে সাধু দেখলো ঠিক যা ভেবেছিল- ছোট বসে বাপ মায়ের সঙ্গে কথা কইছে।

সাধু নিঃশব্দে ফিরে এলো নিজের আস্তানায়— রাত্রে ঘুম নেই চোখে—ভাবছে, আমি গুরু—বারবার আমাকে ঠকালো। এবারে এমন কিছু করতে হবে—যাতে ওর পরিত্রাণ না মেলে!

পরের দিন সাধু লোক পাঠালো ছোটর কাছে—বলে পাঠালো—তার আস্তানায় এসে ছোট যেন দেখা করে।

ছোট জবাব পাঠালো—যাবো।

ছোট জানে, ওস্তাদ গুরু চুপ করে বসে থাকবার পাত্র নয়—তার পিছনে ঘুরছে নিশ্চয়।

ছোট বললে বাপকে—গুরু আমাকে ডেকেছে—আমি যাবো—তুমিও আমার সঙ্গে চলো!

বাপকে নিয়ে ছোট এলো গুরুর কাছে। গুরু বললে—সাবাস ছেলে বটে! গুরুমারা বিদ্যা হয়েছে তোমার। এখন বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ছোট বসলো গুরুর সামনে—গুরু বললে, তুমি জিতেছো ছল-চাতুরীর জোরে। বেশ, ছল-চাতুরীই করো—একবার শেষবারের মতো তোমার সঙ্গে লাগতে চাই—এবারে যদি না জিততে পারো, তাহলে তোমার মরণ···আমার এই পণ।

হেসে ছোট বললে বেশ, আমি রাজী আছি। তাহলে বলি, আমি হবো ছাগল, আর তুমি হবে বাঘ। ছাগল যদি বাঘকে খায়, তাহলে দুনিয়ার লোক আশ্চর্য হবে—আর বাঘ যদি ছাগলকে খায়, তাহলে গুরুর জয়জয়কার!

গুরু রাজী।

তখন ঠিক হলো সহরে ঢোকবার পথে যে ময়দান—ছোট্ সেই ময়দানের মাঝখানে ছাগল হয়ে বাঁধা থাকবে আর সেই ময়দানের পরে যে জঙ্গল, সেই জঙ্গল থেকে গুরু বাঘ হয়ে আসবে ছাগলকে খেতে।

এই ব্যবস্থা করে বাপকে নিয়ে ছোট এলো পথে। পথে এসে বাপকে বললে—তুমি গিয়ে সহরের লোকজনদের জানিয়ে

দাও যে আজকে সন্ধ্যার পর জঙ্গল থেকে একটা বাঘ আসবে সহরে—ভালো ভালো শিকারী দলবেধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে যেন ওখানে লুকিয়ে থাকে। সেই সঙ্গে সহরের জোয়ানের দল যেন লাঠি শোটা নিয়ে তৈরি থাকে। যেমন বাঘকে ফেলা—অমনি চারিদিক থেকে জোয়ানেরা তার উপরে লাঠি-সোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বাপ এ কথা সহরের যত মাতব্বরকে জানালো—শিকারী আর জোয়ানের দল বললে—আমরা তৈরি থাকবো।

সন্ধ্যানাগাদ ছোট ছেলে ছাগলের রূপ ধরলো। তার গলায় দড়ি বেঁধে তাকে নিয়ে বাঘের জন্ম ময়দানের মাঝখানে খুঁটী পুঁতে বাঁধলো। বাঘ তারপর রাত্রে আসছে তাকে খেতে। শিকারী আর জোয়ানের দল তৈরি হয়ে ওৎ পেতে রইলো।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো—জঙ্গল থেকে এক কেঁদো বাঘ ঢুকলো সহরে—ময়দানের দিকে বাঘ এগুচ্ছে। বাঘ দেখলো ময়দানের মাঝখানে খুঁটীতে বাঁধা ছাগল···বাঘ পড়লো ঝাঁপিয়ে ছাগলের উপর।

শিকারী বন্দুকে গুলি ভরে হুশিয়ার ছিল—যেমন বাঘ দিয়েছে লাফ—এক সঙ্গে কটা বন্দুক গুলি ছুড়লো। কটা গুলি লাগলো বাঘের গায়ে—বাঘ কিন্তু পড়লো ছাগলের ঘাড়ে—ছাগলের ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়েই তার গলায় একটি কামড়····দড়ি ছিঁড়ে ছাগলও গা-ঝাড়া দিয়ে পড়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে শিকারীদের গুলি। বাঘের গায়ে কটা গুলি লাগলো··· জোয়ানের দল লাঠিসোঁটা নিয়ে এসে বাঘকে বেদম প্রহার। প্রহারে বাঘ মরে গেল—দুটো গুলি লেগেছিল ছাগলের গায়ে—তার উপর ঘাড়ে বাঘের কামড়।

ছাগল বেশ জখম হয়েছে—তার সর্বাঙ্গে রক্তস্রোত।

ব্রাহ্মণ এলেন ছুটে—ছাগল ধরলো ব্রাহ্মণের ছোট ছেলের রূপ।

ছেলেকে বাড়ী এনে তার রীতিমত চিকিৎসা করলো। মাস খানেক পরে ছেলে সেরে উঠলো কিন্তু পিঠে গুলির চোট লেগে পিঠে বেশ দাগ রইলো—আর ঘাড়ে বাঘের কামড়ের জন্য তার ঘাড়ে রইলো দাগ।

বাপকে সান্ত্বনা দিয়ে ছোট বললে—কেঁদো না বাবা—প্রাণটা তো রক্ষা পেয়েছে—আর ওর হাত থেকে জন্মের মতো নিস্তার পেয়েছি··সুখে শান্তিতে দিন কাটাবো।

খাণ্ডারী বৌ ॥

চন্দন আর কুন্দন—দুজনেই সদাগরী করে—দুজনে খুব ভাব। কুন্দন নিত্য আসে চন্দনের বাড়ী—দুজনে একসঙ্গে তাস-পাশা খেলে। চন্দনের বৌ খুব খাতির যত্ন করে কুন্দনকে—চন্দনের বাড়ীতে কুন্দনের নিত্য হয় খাবার নিমন্ত্রণ। চন্দনের বাড়ী কুন্দনের খুব আদর-যত্ন।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়—একদিন চন্দন ভাবলো, কুন্দন রোজ আসে আমার বাড়ী—আর আমি কোনোদিন কুন্দনের বাড়ী যাই না—এতে শুধু অভদ্রতা প্রকাশ পায়, তা নয়—চন্দনের পক্ষে অন্যায়ও কাজ বটে!

তাই একদিন বৈকালে কুন্দন এ বাড়ীতে আসবার আগে চন্দন এলো কুন্দনের বাড়ী · এসে ডাকলো—কুন্দন।

বন্ধুর ডাক শুনে কুন্দন চমকে উঠলো, তাইতো, চন্দন কখনো আসেনি আমার বাড়ী—আজ হঠাৎ কেন আসে ?

কুন্দন এলো বাহিরে, বললে কি খবর ? তুমি হঠাৎ আমার এখানে !

চন্দন বললে—এলুম মানে, তুমি চিরকাল আমার বাড়ীতে যাও—আমি কখনো তোমার বাড়ীতে আসিনা। আমার অন্যায়। তাই আজ এলুম। বন্ধুনীকে বলো, এখানে আজ আমি খাওয়া-দাওয়া করবো। আমি একা আসিনি, আমার ছেলে দুটাকেও নিয়ে এসেছি, গল্প-সল্প করবো—তারপর রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে ছেলেকে নিয়ে বাড়ী ফিরবো।

কুন্দন ভয়ে কাঁটা। তার মাথায় যেন বজ্রপাত হলো !

তিনজনকে খেতে দিতে হবে · সহজ কথা নয়। তার ভয়ের কারণ, কুন্দনের বৌ খাণ্ডারী—অত্যন্ত বদ মেজাজী। সব সময়ে রাগে গরগর করছে, আর রাগের ফাঁকে কুন্দনকে ধরে এমন প্রহার দেয় যে বৌয়ের ভয়ে তার মনে হয়, বাড়ী যেন যমপুরী !

কিন্তু বন্ধুর ইচ্ছা—বেচারী কি করে, বন্ধুকে আর বন্ধুর ছেলেদের যত্ন করে এনে ঘরে বসালো, তারপর বৌয়ের কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে—ওগো শুনেছো !

বৌ তখন খাটে শুয়ে আরাম করছে—বৌ খিঁচিয়ে উঠে বললে, কেন ?

ভয়ে ভয়ে কুন্দন বললে, আমার বন্ধু চন্দন এসেছে তার ছেলেকে নিয়ে—রাত্রে ওরা তিনজনে এখানে খাবে।

ওর বাড়ীতে নিত্য আমাকে কত কি খাওয়ায়—কখনো আমার বাড়ীতে আসে না। আজ যখন এসেছে, আমাদের উচিত, ওদের কিছু খাওয়ানো।

বৌ শুনলো—শুনে কি ভাবলো - বৌ বললে—আচ্ছা।

কুন্দনের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো! সে বললে—আর একটি কথা।

বৌ ঝঙ্কার তুললো—কি?

কুন্দন বললে, আজ ওদের সামনে তুমি মেজাজ গরম করো না—আমার সঙ্গে ওদের সামনে বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো—চন্দনের বৌ আমাকে কী খাতির যত্ন করে! আর ওদের সামনে আমার সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি করো না—মেজাজ বেশ ঠাণ্ডা রেখো।

বৌ বললে—আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

এ কথা বলে কুন্দন এলো বাহিরের ঘরে, বন্ধুর কাছে এসে বসলো।

তার পর রাত্রে খাবার তৈরি—চারখানি আসন পাতা। চারখানি আসনে এসে বসলো, চন্দন, কুন্দন আর চন্দনের দুই ছেলে। বৌ করছে পরিবেশন। চার জনে খাচ্ছে। পাতে খাবার যা পড়েছে, তা সামান্য।

পাতের লুচি ফুরালো, কুন্দন হাঁকলো—ওগো আরো লুচি চাই।

বৌ এসে সকলের পাতে ক'খানা লুচি দিয়ে গেল।

চন্দনের ছেলে বললে—দু-খানা পটল ভাজা।

কুন্দন হাঁকলো—ওগো, দু'খানা পটল ভাজা।

বৌ এলো—এসে পটল ভাজা দিলে।

বৌয়ের মুখে হুঙ্কার ঝঙ্কার নেই! কুন্দনের হলো ভরসা!

কুন্দর হাঁকলো—আমাকে একটু কালিয়া!

বৌ এলো দুমদুম শব্দে—তার হাতে কালিয়ার হাঁড়ি—এসে কুন্দনের মাথায় হাঁড়ির কালিয়া ঢেলে হাঁড়িটি কুন্দনের মাথায় চাপিয়ে বৌ তুললো হুঙ্কার—নাও, গেলো—শুধু কালিয়া কেন—হাঁড়িটা কড়-মড়িয়ে চিবিয়ে খাও।

তার পর কুন্দনের চুলের ঝুটি ধরে তাকে টেনে তুললো আসন থেকে···তুলে ঝাঁটা-পেটা করে ঝটকা মেরে কুন্দনকে মেঝেয় দিলে ফেলে, তার পর দুম দুম শব্দে ঘর থেকে বৌ গেল বেরিয়ে।

দেখে চন্দন আর তার ছেলেরা তাদের আসন ছেড়ে উঠলো।

চন্দন বুঝলো কুন্দনের অবস্থা। এই বৌয়ের সঙ্গে বাস। কুন্দন যেন মরে গিয়েছে, মরার মতো সাদা তার মুখ!
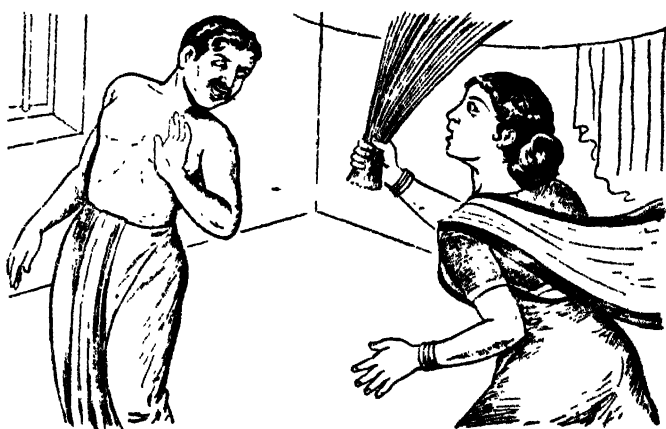
চ দন দিলে তাকে সান্ত্বনা—কি করবে ভাই! মেয়েদের

মেজাজ কখন কেমন থাকে, কিসে বেগড়ায়, কিছু বোঝবার উপায় নেই!

কুন্দন বললে, বৌয়ের মেজাজ সব সময়েই এমনি--বাড়ীতে আমি কি সাধে থাকতে পারি না? সাধে তোমার ওখানে গিয়ে পড়ে থাকি!·· তা কিছু মনে করো না বন্ধু—আমার কথা মনে করে—মনে দুঃখ রেখো না।

—না, না, না! তবে তোমার জন্য বড় দুঃখ হয় ভাই। দেখি কি করতে পারি।

ছেলেদের নিয়ে চন্দন বাড়ী ফিরলো। ফিরে চন্দনের চিন্তা, কি করে এ দজ্জাল বৌয়ের হাত থেকে বন্ধুকে উদ্ধার করা যায়!

ভেবে ভেবে একটা উপায় স্থির হলো। তখন চন্দন বললে বড় ছেলেকে ডেকে—দেখে এলে তো কুন্দনের দুর্দশা। এখন ঐ বৌয়ের হাত থেকে কুন্দনকে আমি উদ্ধার করতে চাই! তোমাকে তার জন্য একটি কাজ করতে হবে।

ছেলে বললে—কি কাজ বলুন?

চন্দন বললে, কাল বিকেলে যাবে কুন্দনের বাড়ী—গিয়ে বৌকে বেশ খাতির করে বলবে আমাদের বাড়ীতে রাত্রে ভোজ আছে—সে ভোজে তাকে আসতে হবে—নিমন্ত্রণ—তার পর তাকে নিয়ে রাত্রে নির্জন বনে নিয়ে গিয়ে যদি পারো···

কি পারার কথা বাবা না বললেও ছেলে বুঝলো। ছেলে বললে—বেশ, তাই হবে।

চন্দন বললে—ও বৌয়ের মরণ না হলে কুন্দনের নিস্তা নেই।

পরের দিন বিকেলে ছেলে গেল কুন্দনের বাড়ী—এসে বৌকে বললে—কাকিমা, আমাদের বাড়ী আজ রাত্রে ভোজ—তোমার নিমন্ত্রণ—তোমাকে আমি নিতে এসেছি।

বৌ খুব খুসী। কখনো কারো বাড়ী নিমন্ত্রণ খায় না। বৌ সেজে গুজে তৈরী হলো। তৈরী হয়ে বৌ বেরুলো চন্দনের ছেলের সঙ্গে।

ছেলে তাকে নিয়ে এলো এক নির্জন বনে—বনের মধ্যে বড় একটা কূয়ো—বৌ আর ছেলে দুজনে চলেছে পাশাপাশি—যেমন সেই কূয়ার কাছে এলো—বৌকে ঠেলে ফেলে দিলে কূয়ার মধ্যে। ভাবলো এবারে আপদ বিদায়! ছেলে সোজা বাড়ী ফিরলো।

কূয়াটা বহু কালের পুরানো—কূয়ার মধ্যে জল নেই, কূয়ার মধ্যে বাস করে এক দৈত্য। রাত হয়েছে, দৈত্য চরতে বেরুবে—সে বসেছিল তৈরি হয়ে কূয়ার মধ্যে—হঠাৎ ঝপ করে তার পিঠে পড়ল খাণ্ডারী বউ। কি পড়লো? দৈত্য চমকে উঠলো—তার মনে হলো, বুঝি আকাশখানা ভেঙ্গে পড়েছে!

তারপর দৈত্য দেখলো যে আকাশ নয়—একটা মানুষ। দৈত্যের ভয় ভাঙ্গলো। দৈত্য বললে—কে তুই আমার পিঠে পড়লি ঝুপ করে—ভয় ডর নেই? আমি হলুম দৈত্য।

বৌ বললে—তুই দৈত্য—আমি হলুম তোর চেয়ে বড় দৈত্যের দিদি। আমি দৈত্যকে ভয় করি না।

এমন কথা দৈত্য কখনো শোনেনি—শোনবার সম্ভাবনাও ছিলনা। চেয়ে সে দেখলো—মেয়েটি সুন্দরী।

দৈত্য বললে—তাই যদি তাহলে আমাকে বিয়ে করো।

আমি বিয়ে করবো ভাবছিলুম। কিন্তু মনের মতো বৌ পাচ্ছি না! কি বলো—রাজী।

খাণ্ডারী বৌ বললে—বিয়ে করবো কিন্তু আমার একটি সর্ত আছে।

দৈত্য বললে—বলো তোমার সর্ত।

বৌ বললে—রোজ সকালে উঠে তোমার মাথায় গুণে গুণে একশোবার জুতো পেটা করবো।

দৈত্য বৌ চায়। সে বললে—আমি এ সর্ত্তে রাজী।

বিয়ে তো হলো—তার পরে রোজ সকালে খাণ্ডারীর হাতে সকালে একশো করে গুণে গুণে জুতার ঘা।

মাসখানেক পরে আর সহ্য হলো না···দৈত্যের মাথায় থক্‌থকে ঘা·· সারাক্ষণ মাথা জ্বালা করছে।

একদিন দৈত্য উঠলো কূয়া থেকে—এক জায়গায় বসলো। বসবামাত্র মাথার ঘায়ে রাজ্যের মাছি এসে বসলো। একে ঘায়ের জ্বালা, তার উপর মাছির উৎপাত। দৈত্যের পাগল

হবার জো। সে ভাবতে লাগলো, কি করে এ বৌয়ের হাত থেকে নিস্তার পাবে!

কোনো উপায় ভেবে না পেয়ে দৈত্য মানুষের রূপ ধরলো—ধরে সন্ন্যাসী সেজে গ্রামের মন্দিরে আশ্রয় নিলে।

এখন হয়েছে কি, কুন্দন লজ্জায়, ঘৃণায় বাড়ী থেকে সন্ন্যাসী সেজে বেরিয়ে ঐ মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে—তার অনেক টাকা-কড়ি। টাকা-কড়ি এনেছে—দুহাতে সে দান করে। তার অনেক ভক্ত জুটেছে। তারা মন্দির ঝাঁট দেয়—ফুল তোলে—মন্দিরের নানা কাজ করে।

দৈত্য-সন্ন্যাসী এলো কুন্দনের কাছে, এসে বললে—আমিও সন্ন্যাসী—তোমার কাছে আশ্রয় চাই। মন্দির ঝাঁট দেবো—পূজার ফুল তুলবো—তোমার ফাই-ফরমাস খাটবো… দয়া করে আমাকে আশ্রয় দাও।

কুন্দন আর তার ভক্ত সন্ন্যাসীরা বললে—বেশ, এখানে থাকো।

দৈত্য তো রইলো—মন্দিরের কাজকর্ম্ম করে—সকলেরই ফরমাস খাটে—কিন্তু খাবার সময় সে একা খায় বিশ জনের খোরাক। সন্ন্যাসীদের খাবারে টান পরে।

দিনের পর দিন-এমনি ভাবে কাটে। একদিন দৈত্যকে আড়ালে ডেকে কুন্দন বললে—সন্দেহ হচ্ছে তোমার খাওয়ার বহর দেখে—তুমি মানুষ নও—মানুষ এমন খেতে পারে না। তুমি ভূত না দৈত্য? সকলের মনে এই সন্দেহ।

দৈত্যের ভয় হলো। তবু সে বললে—না, না, কি বলো, তুমি! আমি মানুষ।

কুন্দন বললে—তুমি যা বললে—আমরা বিশ্বাস করবো

কেন? যাই তুমি বলো, তাহলে এখানে তোমার থাকা হয় না তো।

এমন নিরাপদ আশ্রয়···এ আশ্রয় ছেড়ে কোথায় যাবে? সেই কূয়া—সেখানে গেলে সর্বনাশ।

দৈত্য বললে—তাহলে আমি সব কথা বলি। আমি মানুষ নই, দৈত্য। কূয়ার মধ্যে থাকতুম—হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর একটা মেয়েমানুষ ঝপাৎ করে পড়লো কূয়ার মধ্যে আমার পিঠে। বললে, তুমি দৈত্য—আমি দৈত্যের দিদি। সে দৈত্য, আমিও দৈত্য—তাকে বিয়ে করলুম। বিয়ে করে আমার দুর্দশার সীমা নেই। রোজ সকালে মাথায় গুণে গুণে একশোবার জুতোর ঘা। মাথা ফুলে মাথায় ঘা হয়ে মরি শেষে। তার হাত থেকে নিস্তার পেতে পালিয়ে মানুষ হয়ে সন্ন্যাসী সেজে এখানে নিরাপদে বাস করছি।

কুয়ার মধ্যে বৌ। কুন্দন বুঝলো এ তার বৌ। কুন্দনের মমতা হলো। সে বললে—বুঝেছি। কিন্তু এখানে আর সকলে···

হাত জোড় করে দৈত্য বললে—দয়া করো সাধুজী—কারো কাছে এ কথা বলো না। আমাকে কয়েকদিন আরো থাকতে দাও, তার জন্য আমি এ রাজ্যের রাজার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়ে দেবো!

কুন্দন বললে—কি করে?

দৈত্য বললে,—মানুষকে যেমন ভূতে পায়—তেমনি দৈত্যে পায়। এ রাজ্যের রাজকন্যা—আমি আজই তাকে ভর করবো—রাজকন্যার খুব অসুখ হবে—পাগলের মতো হবে তার আচরণ—রাজা বদ্যি ডাকবেন—চিকিৎসা করাবেন—কিন্তু কোন চিকিৎসায় ফল হবে না। এ খবর রাজ্যে রাষ্ট

হবে—তখন গিয়ে রাজাকে বলবে, তুমি সারাতে পারো—তবে সর্ত, সারলে রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে হবে। কন্যার প্রাণের জন্য রাজা রাজী হবেন। তুমি গিয়ে রাজকন্যার কানে কানে শুধু বলবে—আমি এসেছি। ব্যস্ তখনি আমি রাজকন্যাকে ছেড়ে চলে আসবো।

কুন্দন রাজী হলো। তখন দৈত্য গিয়ে রাজকন্যার দেহে ভর করলো। রাজ্যে হুলুস্থূল পড়লো—কত বৈদ্য আসে—কত ওষুধ দেয়—কিছু হয় না। রোজ আসে, ঝাড়ফুঁক করে, মন্ত্র পড়ে, তাতেও কিছু হয় না। রাজা তখন ঘোষণা করলেন—কন্যাকে যে সারাতে পারবে, তার সঙ্গে তিনি দেবেন তাঁর কন্যার বিবাহ।

ঘোষণা শুনে কুন্দন গিয়ে দাঁড়ালো সভায়, বললে—আমি সারাবো রাজকন্যাকে।

রাজা তাকে নিয়ে কন্যার কাছে এলেন। কন্যা তখন নাচছেন, কাঁদছেন, মাথার চুল ছিঁড়ছেন।·· কুন্দন তাঁর কাছে গিয়ে বসলো—চোখ বুজে যা-তা মন্ত্র পড়লো খানিকক্ষণ—তারপর রাজকন্যার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে—আমি এসেছি!

যেমন এ-কথা বলা, ব্যস্—দৈত্য গেল চলে—রাজকন্যাও সুস্থ হলেন।

রাজকন্যার সঙ্গে তখন হলো কুন্দনের বিবাহ। রাজার জামাই হয়ে কুন্দন পরম সুখে রাজপুরীতে বাস করতে লাগলো।

দৈত্য কিন্তু রাজকন্যাকে ছাড়লেও রাজ্য ছাড়লো না। এর বাড়ীতে, তার বাড়ীতে উপদ্রব করে বেড়ায়। কিন্তু সে

দু-একদিনের জন্য…কাজেই এ ব্যাপার নিয়ে রাজ্যে হুলস্থুল পড়ে গেল।

একদিন দৈত্য এসে কুন্দনের সঙ্গে গোপনে দেখা করলো—দেখা করে কুন্দনকে বললে—শোনো, রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়েছি আমি—কিন্তু এখন আমি যা করবো, তাতে তুমি বাধা দেবে না।

কুন্দন বললে—তার মানে? কি করবে?

দৈত্য বললে—এ রাজ্যের মন্ত্রীকন্যা অপরূপ সুন্দরী—তাকে আমি ছেড়ে থাকতে পারবো না—আমি তার উপর ভর করবো—তুমি আমাকে তাড়াবার জন্য মন্ত্রতন্ত্র করবে না—কিছু করবে না। যদি করো, তাহলে তোমাকে আমি চিবিয়ে খাবো।

কুন্দন বললে—আচ্ছা।

দুদিন পরে মন্ত্রীকন্যার অবস্থা হলো রাজকন্যার মতো…অর্থাৎ—বদ্ধ পাগলের ভাব।

মন্ত্রী এসে রাজাকে বললেন—জামাই-রাজা যদি দয়া করে আমার কন্যাকে সারান!

রাজা বললেন কুন্দনকে এ কথা।

কুন্দন রাজী হতে চায় না, বলে—আমার মন্ত্র একবার খেটে ছিল—বারবার খাটবে না। বিশেষ এক বছরের মধ্যে।

রাজামানুষ—কি কথায় খুসী হন, আর কি কথায় মেজাজ হয় বদ, বলবার জো নেই!

এ কথায় রাজা রেগে আগুন। তিনি বললেন,—

আমার মন্ত্রীর কন্যা···তাকে সারাতেই হবে—না হলে বিপদ হবে তোমার।

কুন্দন ভাবলো, সর্বনাশ। ওদিকে দৈত্য বলেছে, চিবিয়ে খাবে—আর এদিকে রাজা বলছেন, বিপদ হবে।

নিরুপায়!

কুন্দন চললো মন্ত্রীর বাড়ী! মন্ত্রী তাকে নিয়ে এলো কন্যার কাছে—কুন্দনকে দেখে মন্ত্রীকন্যা চীৎকার করে উঠলো—তুমি এসেছো এখানে! তোমাকে এখনি চিবিয়ে খাবো।

কুন্দন বললে—আহা, তা নয়, তা নয়····শোনো আগে কেন এসেছি, তারপরে চিবিয়ে খেয়ো।

মন্ত্রীকন্যা বললে—কেন এসেছো, শুনি?

কুন্দন তখন মন্ত্রীকন্যার কানের কাছে মুখ এনে বললে—সে এখানে এসেছে তোমার খোঁজ পেয়ে। মন্ত্রীমশায়ের বাড়ীর দোরে এতক্ষণে বোধহয় এসে পড়েছে—সেই খাণ্ডারী বৌ! তাই তোমাকে হুঁশিয়ার করতে এলুম।

এঁ্যা! বলে প্রকাণ্ড চীৎকার করে মন্ত্রীকন্যা পড়লো অজ্ঞান হয়ে—তারপর যখন জ্ঞান হলো; তখন দিব্যি সুস্থ মানুষ। দৈত্য পালিয়ে গিয়েছে।

তারপর এ রাজ্যে আর দৈত্যের কোনো উপদ্রব হয়নি।

অতিবুদ্ধির ফল

গাঁয়ে থাকে এক মুদি—চাল ডাল নুন তেল ঘী বেচে—তার মস্ত দোকান। গাঁয়ের সত লোক তার দোকান থেকে জিনিষ-পত্র কেনে।

একদিন মুদি চলেছে সহরে টাকা-কড়ি নিয়ে—সহর থেকে অনেক জিনিষ-পত্র কিনে আনবে। যেতে যেতে পথে গাঁয়ের এক চাষার সঙ্গে দেখা।

চাষা খুব গরীব—সে চলেছে সহরে। সেখানে এক মহাজন—মহাজনের কাছে চাষার ঠাকুর্দা একশো টাকা ধার করেছিল—সে টাকার সুদ তার ঠাকুর্দা আর বাপ বরাবর দিয়ে এসেছে মাসে মাসে। বাপ-ঠাকুর্দা মারা যাবার পর চাষা মাসে মাসে গিয়ে মহাজনকে সুদ দিচ্ছে—মহাজন বলেছে—শুধু সুদ দিলে আর চলবে না—আসল একশো টাকা দিতে হবে। না দিলে চাষার খেত-খামার জমি-জমা মহাজন কেড়ে নেবে। চাষা তাই চলেছে সহরে মহাজনের কাছে—হাতে পায়ে ধরে আরো কিছু সময় ভিক্ষা করবে।

মুদির সঙ্গে দেখা হলে মুদি বললে চাষাকে—তিনপুরুষের দেনা একশো টাকা—আজো শুধতে পারোনি। সময় পেলেই বা কোথায় পাবে একশো টাকা ?

চাষা বললে—কিছু জমি জমা বেচে জোগাড় করবো।

মুদি বললে—তোমার বরাত মন্দ। দুঃখ করলে বরাত তো ফিরবে না। বুদ্ধি খেলাতে পারো যদি তাহলে যদি বরাত ফেরাতে পারো!

তোমার কাছে কত টাকা আছে?

চাষা বললে—সুদের পঁচিশটি টাকা।

মুদি বললে—আমিও সহরে চলেছি—চলো আমার সঙ্গে। এখন বসে বসে একটা গল্প করো।

মুদি ভয়ানক লোভী। ভাবলো, চাষা তো—বুদ্ধি সুদ্ধি নেই—ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদি ঐ পঁচিশটা টাকা নিতে পারি—সেটি করা যাক।

মুদি বললে—শোনো তোমাকে তাহলে একটা গল্প বলি—আমার গল্প।

চাষা বললে—বলো—তোমার গল্প শুনি।

মুদি বললে—আমি শুধু গল্প বলবো না—তোমাকেও বলতে হবে গল্প। গল্প শুনে যে বলবে, মিথ্যা গল্প—তাকে দিতে হবে তার কাছে টাকাকড়ি যা আছে, তার সব। বাজি। ছাখো রাজী?

চাষা বললে—রাজী।

মুদি তখন গল্প সুরু করলো—

তুমি তো জানো আমার বাবার ঠাকুরদা—আমাদের জাতে ছিল সবার বড়! আমার বাবার ঠাকুরদা একদিন চল্লিশখানা জাহাজে হীরে জহরত ভর্ত্তি করে বেরুলো চীন দেশে সে হীরে জহরৎ বেচতে।

চাষা বললে—আজ্ঞে, এ কথা কে না জানে, বলুন।

—হুঁ। মুদি বললে—ঠাকুরদা চীনে রয়ে গেল—সেখানে কোটি-কোটি টাকা রোজগার করলো—তারপর বাবার ঠাকুর্দা চীনে রয়ে গেল—সেখানে কোটি-কোটি টাকা রোজগার করলো—তারপর বাবার ঠাকুর্দা গাঁয়ে ফিরলো। এত রকমের জিনিষ নিয়ে এলো চীন থেকে—আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিষ! সেই-সঙ্গে নিয়ে এলো খাঁটী সোনায় তৈরী প্রকাণ্ড এক সোনার মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি কথা কয় মানুষের মতো। তাকে যে-কথা জিজ্ঞাসা করবে, সে তার জবাব দেবে। তাকে চিনির দাম জিজ্ঞাসা করো—আর কোন্ মানুষ মরে ভূত হয়েছে, কোন্ মানুষ স্বর্গে গিয়েছে—সব বলে দিতে পারবে। একেবারে ঠিক্ঠাক্।

চাষা বললে - এ কথা আমরা জানি বৈ কি!

মুদি বললে—বাড়ীতে কত দেশ থেকে কত জিনিস আসতো! বাড়ীতে রোজ যত লোক আসতো—মূর্ত্তিকে নানা কথা জানাতে—জবাব পেয়ে তারা খুশীমনে চলে যেতো! একদিন তোমার বাপের ঠাকুর্দা এসে মূর্ত্তিকে জিজ্ঞাসা করলে—এত জাতের মানুষ আছে—এদের মধ্যে কোন্ জাতের মানুষের বুদ্ধি সব চেয়ে বেশী? তাতে মূর্ত্তি জবাব দিলে—মুদি জাত! তারপর তোমার বাপের ঠাকুরদা জিজ্ঞাসা করলে—আর সবচেয়ে বোকা? মূর্ত্তি দিলে জবাব—চাষা জাত! একথা নিশ্চয় জান?

চাষা বললে—আজ্ঞে, খুব জানি।

মুদি বললে—এই মূর্ত্তির কথা রাজা শুনলেন! রাজ্যের মন্ত্রী মারা গেলে রাজা হাতী পাঠিয়ে আমার বাপের ঠাকুরদাকে নিয়ে গেলেন। নিয়ে গিয়ে তাঁকে বললেন—আজ থেকে

তুমি হলে এ রাজ্যের মন্ত্রী। কিন্তু ঐ মূর্ত্তিটি আমাকে দিতে হবে। মূর্ত্তিটি আমি আমার তোষখানায় রেখে দেবো।

বাবার ঠাকুরদা রাজাকে দিলেন সে মূর্ত্তি। দিয়ে তিনি হলেন মন্ত্রী। তারপর বাবার ঠাকুরদা মারা গেলে আমার ঠাকুরদা হলো মন্ত্রী। ঠাকুরদা ছিল ভয়ানক খেয়ালী—রাজার কথা ঠাকুরদা মানতেন না।

রাজার হলো রাগ—রাজা হুকুম দিলেন—আমার ঠাকুরদাকে হাতীর পায়ের নীচে ফেলে পিষিয়ে মারতে।

একটা ক্ষ্যাপা হাতী ধরে এনে তার পায়ের তলায় ঠাকুরদাকে ফেলা হলো—কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার—ক্ষ্যাপা হাতী ঠাকুরদাকে দেখে দু'পা তুলে এমন শান্ত হয়ে দাঁড়ালো—কে বলবে, ক্ষ্যাপা হাতী। তারপর হাতী তার শুঁড়ে ধরে ঠাকুরদাকে নিজের পিঠে তুলে নিলে। জানো তো এ সব। চাষা বললে—আজ্ঞে খুব জানি।

মুদি বললে—হুঁ। তা দেখে রাজা অবাক। তখনি আর কথা নয়—ঠাকুরদার হাত ধরে হাতীর পিঠ থেকে নামিয়ে আবার তাকে তিনি মন্ত্রী করলেন। তারপর ঠাকুরদা মারা গেলে আমার বাবাকে রাজা মন্ত্রীর গদি দিলেন। বাবার কিন্তু সেকাজ ভালো লাগলো না। বাবা দেশে দেশে ঘুরতে লাগলো—নানা দেশে ঘুরে একটি দেশে আসতে দেখে প্রকাণ্ড একটা মশা। মশা বাবাকে কামড়াবে—বাবা হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বললে—আমাকে দয়া করে কামড়াবে না মশা-জী—আমার বড্ড লাগবে।

মশা বাবাকে কামড়ালো না। মশা বললে—তোমার মত মানুষ আমি কখনো দেখিনি—তুমি মহাত্মা…মহাপুরুষ। আজ

থেকে আমি তোমার দাসানুদাস। একথা বলে মশা হাঁ করলো—এত বড় হাঁ! বাবা দেখলো—তার হাঁয়ের মধ্যে টাগরার কাছে মস্ত এক সোনার পুরী। পুরীর অনেকগুলো দরজা-জানালা—পুরীর একটি জানলার ধারে বসে পরমাসুন্দরী একটি কন্যা। সেই পুরীর ফটকের ধারে বাবা দেখলো, একটা চাষা—চাষা ভাবছে কন্যাকে চুরি করবে। বাবা বুঝলো তার মতলব—মস্ত বীর তো—মশার হাঁ-এর মধ্যে ঢুকে…একেবারে মশার পেটের মধ্যে সেঁধুলো—মশার পেটের মধ্যে ভয়ানক অন্ধকার! উঃ।

চাষা বললে—জানি, জানি—বাবার মুখে আমি এ কথা শুনেছি।

মুদি বললে—খানিক পরে অন্ধকার কেটে আলো ফুটলো—বাবা দেখলো—সেই চাষা দাঁড়িয়ে আছে। বাবা তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। এক বছর চাষার সঙ্গে চললো বাবার ধস্তাধস্তি—সেই মশার পেটের মধ্যে। চাষা হারলো—হেরে চাষা আমার বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়লো। সে চাষা কে, জানো? তোমার বাবা। তারপর সেই কন্যাকে আমার বাবা করলো বিবাহ। বিবাহ করে মশার পেটের মধ্যে বাবা রইলো কিছুকাল—চাষাকে করলো বাবা পুরীর দ্বারী। সেই কন্যা হলো আমার মা। আমার জন্ম সেই পুরীতে। তারপর আমার বয়স যখন পনেরো বছর, তখন আমার মাকে আর আমাকে নিয়ে বাবা ফিরলো দেশে—তোমার বাবাকেও বাবা নিয়ে এলেন সঙ্গে। দেশের লোক বাবাকে দেখে খুব খুশী। তোমার বাবাকে আমার বাবা দিলেন জমি-জমা। বললে—চাষবাস

করো গিয়ে তুমি। যে জমিতে চাষবাস করছো, জানো, ও জমি আমার বাবার দেওয়া।

চাষা বললে—আজ্ঞে, খুব জানি।

মুদি চমকে উঠলো। ভাবলো—এ এমন বোকা এমন কথাও বিশ্বাস করে! মুদি বললে—ও জমি বেচে তুমি মহাজনের টাকা শুধবে, বলছো—কিন্তু তা তো তুমি পারো না। ও জমি এখন আমার—আমি ওর মালিক।

চাষা বললে—আজ্ঞে তা আর জানি না! এবার আমার গল্প শুনুন—আমার গল্প মিথ্যা নয়—আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, শুনলেই বুঝবেন।

মুদি বললে—বলো, শুনি তোমার গল্প।

তখন চাষা সুরু করলো তার গল্প।

চাষা বললে—আমার বাবার ঠাকুরদা—তার ছিল অনেক টাকা…গাঁয়ে আর কারো এত টাকা ছিল না। আর তার কী জ্ঞান, কত বুদ্ধি। গাঁয়ের লোকজন তার কাছে আসতো বুদ্ধি নিতে সব বিষয়ে। সে ছিল গাঁয়ের মোড়ল—সকলে তার কথা মেনে চলতো। গরীব দুঃখীর উপরে তার ছিল ভারী দয়ামায়া। রাজা, মন্ত্রী—তাঁরাও বাবার ঠাকুরদাকে খুব মানতেন—তার কাছে তাঁরা আসতেন পরামর্শ নিতে। বাবার ঠাকুরদার গায়ে জোরও ছিল খুব—জোয়ান বেপরোয়া মানুষ ছিল। তার ছিল পোষা মশা, ছারপোকা। জানেন তো।

মুদি বললে—জানি বৈ কি!

চাষা বলতে লাগলো—তারপর একবছর বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই—খাল বিল পুকুর—সব শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে—ক্ষেতে ফসল নেই। দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ—না খেয়ে লোক মরছে।

আমাদের মরাইয়ে এত এত ধান-চাল আর গম মজুত— বাবার ঠাকুরদা দুহাতে সকলকে বিলোতে লাগলো—শেষে আমাদের ভাঁড়ার খালি হয়ে গেল। তখন বাবার ঠাকুরদা গাঁয়ের সকলকে ডেকে বললে—তোমরা যদি আমার কথা শোনো, তাহলে আমি ব্যবস্থা করতে পারি। কেঁদে সকলে বললে—আপনি যা বলবেন, করবো মোড়লমশাই! আমাদের বাঁচান।

বাবার ঠাকুরদা বললে—সকলের ক্ষেত আমার হাতে ছেড়ে দাও—সব ক্ষেতে আমি সোনা ফলাবো। সকলে রাজী। বাবার ঠাকুরদা তখন মালকোঁছা এঁটে খুঁটীর পাশ দিয়ে সারা দেশের যত ক্ষেত নিজের হাতে লাঙ্গল দিয়ে চষতে লাগলো—হাজার হাজার বিঘে জমি চষা—জানেন এ কথা?

গল্প শুনে মুদির দুচোখ কপালে ওঠার জো! তবু সে বলল, জানি বৈ কি, খুব জানি।

চাষা চলল—সেই হাজার বিঘে জমি নিজের মাথায় তুলে বাবার ঠাকুরদা বেরুলো গাঁ থেকে—বেরিয়ে যেখানে যে গাঁয়ে বৃষ্টি হয়, সেই সব গাঁয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। এমনি করে বিশখানা গাঁ ঘুরে ক্ষেতে জল দিলে—ক্ষেতের মাটি ভিজলো—তখন সেই ক্ষেতে বীজ বুনলো—তার মাথার উপর উঠে বিশখানা গাঁয়ের চাষা লাঙ্গল দিতে লাগলো। দেখতে দেখতে ধান আর গম যা ফললো ওঃ; মা অন্নপূর্ণা যেন কোথাও আর ধান বা গম রাখেন নি।

তখন সেই ফলন্ত ক্ষেতগুলো মাথায় নিয়ে বাবার ঠাকুরদা গাঁয়ে ফিরলো—দেশের দুর্ভিক্ষ ঘুচলো। জানেন তো এ কথা?

ঢোঁক গিলে মুদি বললে—জানি, খুব জানি।

চাষা বললে—সে সময়ে আপনার বাবার ঠাকুরদার অবস্থা

খুব খারাপ! খেতে-পরতে পান না। বাবার ঠাকুরদা তাঁকে বললে - তুমি আমার ধানের গোলায় চাকরি করো—ধান চাল বেঁচবে—আমি দেবো তোমাকে খেতে-পরতে—তার উপর রোজ দেবো তোমাকে আট কুনকে করে চাল—তোমার সংসারের জন্য। এ কথা আপনি জানেন নিশ্চয়ই?

রাগে জ্বলছে মুদি। তবু বললে- জানি, জানি।

চাষা বললে—আপনার বাবার ঠাকুরদা গোলায় কাজ করতে লাগলো। তিনি খুব খাটতে পারতেন, জোয়ান মানুষ তো—দিন-রাত খাটতেন—একদণ্ড কাজের কামাই ছিল না। কিন্তু শুধু ঐ জোয়ান শরীর—ঘটে বুদ্ধি ছিল না এককড়া। নিরেট বোকা। মাপের হিসাব রোজ ভুল হতো, তার জন্য বাবার ঠাকুরদার কাছে কত মার খেতেন। জানেন তো?

মুদি বললে - জানি—শুনেছি।

তারপর দুজনে উঠে চলতে লাগলো—চলতে চলতে দুজনে এলো চাষার মহাজনের দোকানে।

চাষা বললে মুদিকে—একটু বসে তামাক খেয়ে নাও, গল্পটা শেষ করি—শুনে তবে যাবে।

মুদি বসলো। চাষা বলতে লাগলো—এ সব কথা তো জানবেনই। তারপর জানেন তো, বাবার ঠাকুরদার ধান চাল সব বিক্রী হলো - আপনার বাপের ঠাকুরদার চাকরিটি গেল। তখন তাঁর দিন চলবে কি করে? আপনার বাবার ঠাকুরদা কেঁদেই আকুল। বাবার ঠাকুরদা তখন এই মহাজনের কাছ থেকে একশোখানি টাকা ধার করে তাঁকে দিলে।

মহাজনকে আমার বাপের ঠাকুরদা বললে—লোকটা খুব দুঃখ-দুর্দশায় পড়েছে—টাকাটা ওকে দাও, যত দিন না টাকা

শোধ হয়, আমি সুদ দেবো। এ মহাজনের কাছে ধার আপনার বাবার ঠাকুরদার জন্য—জানেন তো!

—জানি, জানি।

চাষা বললে—একশো টাকার সুদ আমরা দু'পুরুষ ধরে দিয়ে চলেছি। আপনি যখন আজ এখানে এসেছেন, তখন ওঁর সে একশো টাকা শুধে দিন—আর আমরা দু'পুরুষ ধরে যে সুদ দিয়ে এসেছি তা হবে প্রায় এক হাজার টাকা। সে টাকাটা আমাকে দিয়ে আপনার বাবার ঠাকুরদার দেনা শোধ করুন। এ সব কথা জানেন তো—!

মুদি দেখলো, বাজি যা রেখেছে—না দিয়ে উপায় নেই। তার কাছে টাকা ছিল প্রায় দু'হাজার—সর্তমতো তা থেকে একশো টাকা দিতে হলো মহাজনের—বাকি টাকা দিতে হলো চাষাকে—যেমন তার সঙ্গে বাজি রাখা হয়েছে।

মহাজনের টাকা দিয়ে মুদি বললে—রসিদ লিখে দাও বাপু। চাষাকে বললে—খাশা বুদ্ধি খেলেছো। কে বলে, চাষা জাত বোকা? আমি কান মলছি—বাজে গল্প বলতে আমি ওস্তাদ—আমার গর্ব ছিল—তুমি আমার সে গর্ব চূর্ণ করলে আজ।

রাজা আর রাজার পাঁচকন্যা

রাজা, রাণী আর তাদের পাঁচটি কন্যা।

বিশাল রাজ্য। মন্ত্রী, সভাসদ, অমাত্য, হাতী-ঘোড়া, সেপাইশাস্ত্রী, সৈন্য সামন্ত অসংখ্য। রাজার যেমন ঐশ্বর্য, তেমনি প্রতাপ।

কন্যারা বড় হয়েছে। রাজা কন্যাদের নিত্য দেন কত দামী দামী শাড়ী গহনা।

কন্যারা যখন যে আবদার করেন, রাজা তাঁদের সে আবদার রক্ষা করেন।

তাঁরা যদি বলেন,- আমাদের চাঁদ চাই, তাহলে রাজা আকাশে মই লাগিয়ে চাঁদ পাড়বার চেষ্টা করেন।

একদিন রাজার কি খেয়াল হলো—পাঁচ মেয়েকে ডেকে রাজা বললেন—আচ্ছা, তোমরা যে এই সুখ-ঐশ্বর্য ভোগ করছো—এ আমার বরাতে না তোমাদের নিজের-নিজের বরাতে?

বড় মেজো সেজো ন—চার কন্যা জবাব দিলে—আপনার বরাতে। রাজা শুনে খুশী হলেন।

ছোট কন্যা শুধু বললে—আমাদের নিজের-নিজের বরাতে আমরা এ সুখ-ঐশ্বর্য ভোগ করছি।

বটে! রাজার হলো রাগ। তিনি বললেন—এমন কথা বলো তুমি—আচ্ছা, আমি এমন ব্যবস্থা করবো যে, তোমার নিজের বরাতে কি ঘটে—তা তুমি তখন বুঝবে।

সেদিন রাত্রে রাজার চোখে ঘুম নেই। রাগ যা হয়েছে—সে রাগের ঝাঁজে দেহ-মন তেতে একেবারে আগুন।

ভোর হতেই রাজা বিছানা ছেড়ে উঠলেন—উঠে ঘরের সামনে যে বড় বারান্দা—পথের ধারে···সেই বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

দাঁড়িয়ে তিনি ভাবছেন আর ভাবছেন—ছোটকে কি করে শিক্ষা দেওয়া যায়!

হঠাৎ দেখলো এই ভোরে পথে চলেছে এক ছোকরা—পরণে ময়লা চিরকুট, কাঁধে কুড়ুল।

বুঝলেন, কাঠুরের ছেলে ভোরে উঠে বনে চলেছে কাঠ কাটতে।

রাজা ভাবলেন, ঠিক হয়েছে। এই কাঠুরের সঙ্গে তিনি দেবেন ছোট কন্যার বিবাহ—তার ঘরে গিয়ে ছোট কত সুখ ভোগ করে—দেখবে তখন মজা!

কাঠুরেকে তিনি ডাকলেন, বললেন—পুরীতে এসো। কাঠুরে ভয়ে কাঁটা—কি অপরাধ সে করেছে যার জন্য এই ভোরে মহারাজ তাকে ডাকছেন?

কাঁপতে কাঁপতে কাঠুরে এলো প্রাসাদে। রাজা তাকে সভায় এনে বসালেন—সভায় তখনও মন্ত্রী অমাত্যরা আসেননি।

রাজা বললেন—আজ তুমি কাঠ কাটতে যেতে পাবে না। আমার ছোট কন্যার সাথে আজ রাত্রে তোমার বিয়ে দেবো।

কাঠুরে চমকে উঠলো। সে স্বপ্ন দেখেছে না কি? কিন্তু না—স্বপ্ন নয় তো!

হাত জোড় করে কাঠুরে বললে—এমন কথা বলবেন না মহারাজ। আমি গরীব কাঠুরে—একা মানুষ, ভাঙ্গা চালাঘরে থাকি। বনের কাঠ বেচে রোজ আট-আনা দশ-আনা রোজগার করি—আমার সঙ্গে রাজকন্যার-বিবাহ !

রাজা বললেন—হাঁ, হাঁ। আজ রাত্রে বিবাহ হবে। তার নড়চড় নেই।

রাজার খেয়াল। সেই দিন রাত্রে হলো কাঠুরের সঙ্গে ছোট রাজকন্যার বিবাহ।

রাণী কাঁদলেন—আর চার কন্যা কাঁদলেন—রাজা সে কান্নায় টললেন না।

ছোট কন্যা বললেন—হোক বিয়ে—আমার বরাতে যদি সুখ থাকে, তাহলে এই কাঠুরের ঘরেই সে সুখ ভোগ করবো !

পরের দিন বৌ নিয়ে কাঠুরে যাবে তার ঘরে—সে একেবারে হতভম্ব !

ছোট কন্যা বললেন—ভেবোনা তুমি—আমি বেশ থাকবো তোমার ঘরে।

ছোট কন্যাকে নিয়ে কাঠুরে এলো তার ভাঙ্গা চালায়। পরের দিন ভোরে কাঠুরে বেরুলো কাঠ কাটতে—কন্যা রইলেন ঘরে।

চাল ডাল যা ছিল, রান্না করলেন—দুজনের মতো। এক বেলার আহার—কন্যার তাতে দুঃখ নেই।

সন্ধ্যার সময় কাঠুরে এনে কন্যার হাতে দিল আট আনা পয়সা—কাঠ বেচে রোজগার।

ছোট কন্যা বললেন—কি কাঠ তুমি কাটো ?

কাঠুরে বললে—আম কাঠ, কাঁঠাল কাঠ, দেবদারু কাঠ।

কন্যা বললেন—শোনো, নানা জাতের কাঠ আছে—সব কাঠের এক দাম নয়—কোনো কাঠের দাম বেশী, কোন কাঠের দাম কম।

তুমি কাল থেকে কাঠ কেটে বাড়ীতে আনবে—কত রকম কাঠ আছে—আমি বলে দেবো, কোন কাঠ কত দামে বেচবে। সেই হিসেবে কাঠ নিয়ে গিয়ে তুমি বাজারে বেচবে—তাহলে, রোজগার বাড়বে।

তাই হলো। কাঠ কেটে কাঠুরে সব কাঠ ঘরে আনে—কাঠ বেছে বেছে নানা জাতের কাঠের দাম বলে দেন ছোট রাজকন্যা।

কাঠুরে সেই হিসাব-মতো কাঠ বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচে। রোজগার তাতে কিছু বাড়লো।

সেদিন সন্ধ্যার আগে মাথায় এক মণ কাঠ নিয়ে কাঠুরে ঘরে ফিরলো।

ছোট কন্যা দেখেন, এক মণ চন্দন কাঠ। তিনি বললেন -এ কাঠ খুব ভালো জাতের—এ কাঠ তুমি বেচবে একশো টাকায়—তার এক পয়সা কম দামে বেচবে না।

কাঠুরে কাঠ নিয়ে বাজারে গেল—সে কাঠ বেচে একশো টাকা দাম নিয়ে ঘরে ফিরলো।

ছোট কন্যা বললেন—এখন থেকে শুধু এই কাঠ আনবে রোজ—তাহলে একশো টাকা করে রোজগার হবে। বুঝেছো?

কাঠুরে বললে—বুঝেছি।

পরের দিন থেকে কাঠুরে আনে এক মণ করে চন্দন কাঠ—সে কাঠ বেচে রোজ পায় একশো করে টাকা।

একদিন কর্ত্তা বললেন—তাহলে এক কাজ করো। নিজে কাঠ বয়ে এনো না।

এক কাজ করো,—দু'চারজন লোক নিয়ে যাও, তাদের দিয়ে সব কাঠ কেটে আনো—গাড়ী ভাড়া করে সেই গাড়ীতে চাপিয়ে।

গাড়ী ভাড়া দেবো—যারা কাঠ কাটবে, তাদের দেবো কাঠ কাটার মজুরি—ও কাঠ বনে না রেখে বাড়ীতে এনে জমা করে রাখবো।

পরের দিন লোকজন আর গাড়ী নিয়ে কাঠুরে গেল বনে—সেখানে যত চন্দন কাঠ ছিল, কাটিয়ে গাড়া বোঝাই করে ঘরে নিয়ে এলো।

সে কাঠ বেচে অনেক টাকা হলো—হাজার হাজার টাকা।...

তারপর বনে বনে ঘুরে লোকজন দিয়ে চন্দনকাঠ কাটিয়ে গাড়ী বোঝাই করে সে সব কাঠ রোজ ঘরে আনা হয়। সে কাঠ বেচে ঘরে আসে হাজার হাজার টাকা।

এমনি করে দশ বছর কাটলো—শেষে এমন হলো যে, কোন বনে আর এক টুকরো চন্দন কাঠ নেই।

কাঠুরে ঘরে এসে বললে— কাঠ আর নেই—আছে শুধু গাছের গুঁড়িগুলো।

কর্ত্তা বললেন, গুঁড়িগুলোও আনো।

গুঁড়ি কাটতে কাটতে গুঁড়ির নীচে মিলতে লাগল ঘড়া ঘড়া সোনার মোহর।

রোজ তখন গুঁড়ির সঙ্গে সঙ্গে ঘড়া ঘড়া মোহর আসতে

লাগলো ঘরে। মোহরে মোহরে মোহরের পাহাড় জমলো ঘরে।

ছোট এদিকে মিস্ত্রী মজুর ডাকিয়ে চূণ বালি সুরকি সাদা পাথর আনিয়ে প্রকাণ্ড পুরী তৈরী করালেন—যেন রাজার পুরী।

পুরীর সঙ্গে বাগান, দীঘি, ফোয়ারা···সঙ্গে সঙ্গে পুরীতে অনেক দাস-দাসী—দেউড়িতে দারোয়ান—ঘোড়াশালে ঘোড়া—হাতীশালে হাতী।

সহরের শেষে বনের মুখে প্রকাণ্ড রাজপুরী।

তার পর একদিন কন্যা বললেন কাঠুরেকে—সামনে বিজয়া দশমীর দিন সাত গাঁয়ের লোকজনকে নিমন্ত্রণ করো—ছেলেমেয়ে, জোয়ান, বুড়ো-বুড়ি, দীন-দুঃখী—কাকেও বাদ দেবে না।

সকলে এখানে এসে খাবে পেট ভরে কালিয়া, পোলাও লুচি—দই, রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন।

ভালো ভালো রশুইকার ডাকাও। আমি তাদের সব বলে দেবো।

বিজয়া দশমীর দিন পুরীতে প্রচণ্ড ধূম। সাতখানা গাঁয়ের লোক এসেছে। বিরাট মণ্ডপে তাদের খেতে দেওয়া হয়েছে।

সকলে খাওয়া দাওয়া করছে···গল্পসল্প চলেছে। ছোট কন্যা নিজে সকলের খাওয়া দেখছেন—হঠাৎ তাদের মুখে ছোট কন্যা শুনলেন—বাপ-রাজার রাজ্যের একজন খেতে খেতে বলছে—রাজ্যের রাজা আর সেই পাঁচ পাঁচ কন্যার কথা—ছোট কন্যার সঙ্গে যিনি দিয়েছেন এক কাঠুরের বিবাহ

সে রাজার রাণীর আর তাঁর চার কন্যার কি দুঃখ দুর্দশায় দিন কাটছে।

রাণী আর রাজকন্যাদের নিয়ে রাজ্যহারা রাজা ভিক্ষা করে দিনাতিপাত করছেন।

শুনে ছোট কন্যার বুকখানা ছাৎ করে উঠলো। কিন্তু মনের ভাব চেপে তিনি বেশ সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন— কি হয়েছে রাজার ?

সে লোকটি বললে—তিন চার বছর আগে শত্রু এসে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছে।

রাজ্য ছেড়ে রাণীকে আর চার কন্যাকে নিয়ে মহারাজ বনে বনে ঘুরছেন—ভাঙ্গা একখানি কুঁড়ে ঘরে তাঁরা থাকে।

মহারাজ দোরে দোরে ভিক্ষা করে যা পান, তাতেই তাঁদের দিন চলে।

ছোট কন্যা কথাটা শুনলেন—কোনো কথা বললেন না।

পরের দিন ছোট রাজকন্যা বললেন কাঠুরেকে—পুরীর সামনে ঐ যে ধূ-ধূ মাঠ—ও মাঠে মস্তবড় দাঘি খোঁড়াতে হবে—তাহলে এদিকে জলকষ্ট হবে না। এর জন্য ঢ্যাড়া দিতে হবে, বড় দীঘি খোঁড়বার জন্য অনেক লোক চাই। অনেক লোক পাবে তাহলে।…বুঝলে ?

কাঠুরে বললে—বুঝেছি।

ঢেঁড়া দেওয়া হলো সাতখানা গাঁ জুড়ে !

দলে দলে লোক আসতে লাগলো—ঝোড়া, কোদাল গাঁইতি নিয়ে।

ছোট কন্যা নিজে সকলকে দেখতে লাগলেন।

বললেন—ভালো মজুরি মিলবে আর দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবে। থাকবার জন্য ছাউনি পাবে।

মাঠ খুঁড়ে দীঘি তৈরি হচ্ছে · হাজার হাজার লোক কাজ করছে।

পুরীর ছাদে দাঁড়িয়ে ছোট কন্যা দেখছেন · দেখছেন সকলে কি উৎসাহে কাজ করছে।

মাটি খুঁড়ছে—তার পর ঝোড়ায় তুলে সে মাটি ঢালছে দূরে নিয়ে গিয়ে। মহা সমারোহে কাজ চলেছে।

হঠাৎ চোখে পড়লো, একটি লোক শুধু খানিক মাটি খুঁড়ছে তারপর হাঁপিয়ে বসে পড়ছে····কোদাল রেখে।

লোকটির শরীর রোগা, হাড় জির জির করছে।

ছোট বুঝলে—ওর বড় অভাব নাহলে ও শরীর নিয়ে কেউ মাটি খুঁড়তে আসে না।

মনে হলো, চেনা চেনা মুখ। বাবা নন তো?

তিনি ডাকলেন দাসীকে---ডেকে তাকে বললেন, ঐ যে বুড়ো মানুষটি কাজ করতে করতে বসে ধুঁকছেন—ওর বড় অভাব। না হলে এ শরীরে কেউ কাজ করতে আসে?

ওকে ডেকে আন পুরীতে, ওকে কাজ করতে হবে না। এখানে এসে বসুক, আমি ওকে এমনি টাকা দেবো।

দাসী গিয়ে তাকে পুরীতে নিয়ে এলো।

কন্যা চিনলেন বাপ রাজাকে।

ছোটকন্যাকে কিন্তু বাপ রাজা চিনতে পারলেন না।

তিনি বললেন---আমায় কেন ডাকলেন মা?

ছোট কন্যা বললেন—আমায় চিনতে পারছো না বাবা? আমি তোমার ছোট কন্যা!

—এঁ্যা আমার ছোট! রাজা চিনলেন। তাঁর দুচোখে জল।

তিনি বললেন—তাই তো ছোট—রাগ করে আমি তোমাকে পুরী থেকে দূর করে দিয়েছি গরীব কাঠুরের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়ে। ভেবেছিলুম গরীব কাঠুরের ঘরে নিজের বরাতে কি করে সুখ ভোগ হয় বুঝবে!

আর সেই তুমি আজ আমার চরম দুর্দশার দিনে আমাকে ডেকেছো! কাঠুরের ঘরে এসে তোমার এমন ঐশ্বর্য! আমার দুর্দশার কথা যদি শোনো·

ছোট কন্যা বললেন—থাক সে কথা বাবা। রাজ্য গেছে—এত দুর্দশা ভোগ করছো—এ শুধু বরাত দোষে। দুঃখের কাহিনী বললে তো দুঃখ ঘুচবে না।··এখন মাকে আর দিদিদের আনতে হবে।

ক'খানা পাল্কী দিয়ে বাপ রাজার সাথে ছোট কন্যা লোকজন পাঠালেন—

রাণীমা এলেন, চার বোন এলেন পুরীতে।

কন্যাকে দেখে মা চিনলেন—তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাণী বললেন—তোমাকে যে আবার দেখবো—তা স্বপ্নেও ভাবি নাই! তোমাকে পেয়ে আমি সব ভুলে গিয়েছি।

তারপর সকলের স্নানাহার হলে সকলে বসলেন ঘরে—রাণী বললেন—ছোট ঠিক কথা বলেছিল—সুখ বলো, দুঃখ বলো মানুষ ভোগ করে নিজের বরাতে।

তুমি যদি কাঠুরের সঙ্গে ছোটর বিবাহ না দিতে—তা হলে

আমাদের সঙ্গে থেকে ওরও আমাদের মত দুঃখ ভোগ করতে হোত।

ওর বরাতে এ দুঃখ নেই—তাই ওর কথা শুনে তোমার রাগ হলো—তুমি দিলে কাঠুরের সঙ্গে বিবাহ। বিবাহ দিয়ে ওকে পুরী থেকে বার করে দিলে। কিন্তু ওর বরাতে আছে সুখ—তাই কাঠুরের ঘরে এসেও ওর সুখ-ঐশ্বর্যের সীমা নেই।

রাজা বললেন—ঠিক বলেছো রাণী। অহঙ্কারের মত্ততায় ভুল করেছিলাম—অহঙ্কারের মত্ততায় বুঝতে পারিনি—মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে নিজের বরাতে।